পশ্চিমবঙ্গে এনজিও কার্যকলাপ ও সরকারের সাথে তাদের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি

Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirement for the award of the Degree of Master of Philosophy (M.Phill.) (Arts) in International Relations

Submitted by

Bipra Biswas

University Roll No.-001700703003

Examination Roll No.-MPIN194003

Registration No.-115100 *of* 2011-2012

Under the Guidence of

Dr. Partha Pratim Basu

Department of International Relations

Jadavpur University

Department of International Relations

Jadavpur University

PG Arts Building, Jadavpur University

Jadavpur

Kolkata-700032

2019

ব পু র বি শ্ব বি দ্যা ল য়
া তা - ৭ ০ ০ ০ ৩ ২, ভা র ত

JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

Certified that the thesis entitled "পশ্চিমবঙ্গে এনজিও কার্যকলাপ ও সরকারের সাথে তাদের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি" submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in International Relations of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Jadavpur University thereby fulfilling the criteria for submission as per the M.Phil. Regulation (2017) of Jadavpur University.

Bipra Biswas

NAME- **BIPRA BISWAS**
Class Roll No.- 001700703003
Examination Roll No.: **MPIN194003**
Registration No. **115100** of **2011-2012**

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **BIPRA BISWAS** entitled "পশ্চিমবঙ্গে এনজিও কার্যকলাপ ও সরকারের সাথে তাদের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি" is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts in International Relations of Jadavpur University.

Head	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC
Department of International Relations		
HEAD Dept. of International Relations Jadavpur University	PROFESSOR Department of International Relations Jadavpur University Kolkata – 700 032	Associate Professor Department of International Relations Jadavpur University Kolkata – 700 032

Acknowledgment

I take this opportunity to extend my sincere gratitude to my supervisor, Prof. Partha Pratim Basu for his constant guidance and support throughout the course of this dissertation.Without his expertise, and patience this thesis would not have been possible. I have been extremely lucky to have a supervisor who cares so much about my work, and who responded to my questions and quaries so promptly. I am eternally thankful to him for giving me the scope to grow along with the thesis.

I like to acknowledge the esteemed NGOs like Swayam, Sanjog, Jana Siksha Prachar Kendra and Durbar Mahila Samanwaya Committee for sharing their *modus operandi* and invaluable experiences of field-work. Without this, the present thesis would not have been completed.

I would also like to express a deep sense of gratitude to Prof. Omprakash Mishra, for encouraging me to pursue my interests.I cannot be enough thankful to Prof.Iman Kalyan Lahiri for sharing his invaluable comments and constant support that has helped me see this thesis to its completion. I cannot put to words how much I value his constructive criticisms that helped me to identify and acknowledge the researcher in me.

I also take this opportunity to extend my gratitude to the entire Department of International Relations, Jadavpur University for giving me the technical, moral and mental support to pursue this research. I would not be able to do justice to this work without the constant support of my family,specially my father,Birendra nath Biswas and my brother, Rahul dev Biswas. I thank all of my friends specially Chayan Guha and Jishnu Bose who have helped me in various ways. Having said that, all of the remaining flaws in the thesis are of my own.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভুমিকা	2
সাহিত্য পর্যালোচনা	3
গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নমালা	8
গবেষণা নকশা	9
দ্বিতীয় অধ্যায়	
এনজিও সম্পর্কে ধারণা	
প্রেক্ষিত	11
এনজিওর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	14
এনজিওর প্রকারভেদ	18
ভারতে এনজিওর উৎপত্তি ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	20
তৃতীয় অধ্যায়	
পশ্চিমবঙ্গে এনজিও কার্যকলাপ ও সরকারের সাথে সম্পর্ক	
নির্বাচিত কয়েকটি এনজিওর কাজের বিশ্লেষণ	36
সরকার ও এনজিওর সম্পর্ক	79
সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনজি ও	82
উপসংহার	86
Bibliography	92
পরিশিষ্ট	94

ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এনজিও সংস্থার আবির্ভাব। মূলত Non Governmental Organisations তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ পরিবর্তন এনেছে যার মধ্যে ভারত অন্যতম। তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবামুলক ভূমিকা থেকে দিক পরিবর্তন করে তৃণমূল স্তরের গরীব, বঞ্চিত কিংবা প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষদের প্রথাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামিল করে 'উন্নয়নকে' ক্ষমতার গণতন্ত্রীকরনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিয়েছে এই এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি।মূলত মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপেক্ষিত প্রান্তিক মানুষদের স্বনির্ভর করে তোলাই এদের মূল লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য পূরণের তাগিদে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং যে সমস্ত বিষয় কে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য,কৃষি, পরিবেশ সুরক্ষা, মহিলা উন্নয়ন,শিশু সুরক্ষা, শিশু নিরাপত্তা, শিশুশ্রম এর বিলোপ সাধন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং মানব পাচার রোধ প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল গুলিতে কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে এনজিওদের সাথে সরকারের সমন্বয় যেমন তৈরি হয়েছে একইভাবে বিরোধের ক্ষেত্রও দেখা গিয়েছে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করলেও বিভিন্ন সময়ে সরকার সেই কাজের ওপর নানাবিধ শর্ত আরোপ করেছে। নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বায়ন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় কারক দের কার্যকলাপের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। নতুন শতাব্দীতে এসেও তার প্রভাব অক্ষুন্ন রেখেছে। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া তো বটেই তার প্রভাব পড়েছে আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। ফলত সরকারি কর্মসূচীর ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন এসেছে ঠিক তেমন ভাবেই বেসরকারি কার্যকলাপের গতিপথও অন্য রূপ ধারণ করেছে ।এই বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশ স্বরূপ Non Governmental Organisation কিভাবে তাদের কর্মসূচী গুলিকে বাস্তবায়িত করছে,এদের প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু,গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার যদি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হয় তাহলে এন জিও প্রতিষ্ঠানের উত্থানের কারণ কি , প্রশাসনের প্রভাব থেকে এরা কতখানি মুক্ত,কিংবা সরকারের সাথে এদের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি কেমন,কতটা স্বাধীন ভাবে এরা নিজেদের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম, এই বিষয়গুলো আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে।তবে মূল আলোচনার বিষয় হলো বিগত দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের গতি প্রকৃতি।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সাম্প্রতিক সময়ে তৃতীয় বিশ্বের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল এনজিওর আবির্ভাব। ধরে নেওয়া হয় ভারতবর্ষে মূলত নয়ের দশক থেকে এই শব্দদ্বয় বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছে।সাধারন ভাবে বলা যায় সরকারি নিয়ন্ত্রনের বাইরে বেরিয়ে দেশ ও দশের এক কথায় সমাজের স্বার্থে সমবেত এক প্রয়াস হল এন জিও উদ্যোগের ভিত্তি।তবে সরকার এবং গণমাধ্যমের দৌলতে এই শব্দদ্বয় সমসাময়িক কালে পরিচিতি লাভ করলেও এদের বিবর্তনের প্রেক্ষিত, কাজের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ,কাজের প্রকৃতি ,প্রক্রিয়া প্রভৃতি নিয়ে অধিকাংশ মানুষই অবগত নন।

অন্যদিকে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় এনজিওর প্রতি একাংশের মানুষ বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।এনজিও সংস্থার কার্যকলাপ কিংবা কাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অনেক তাত্ত্বিক এবং গবেষক দেখিয়েছেন যে এরা মূলত স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে লিপ্ত থাকে, কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করে আবার কখনও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথেও যুক্ত থেকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়।এই লক্ষ্যের বাস্তবায়নের সময় কিছু ক্ষেত্রে সরকারের সাথে সংযোগ বজায় রেখে চলতে হয় আবার পরিস্থতি খারাপ আকার ধারন করলে বিরোধিতার প্রশ্নও উঠে আসে।কাজের মধ্যে দিয়ে প্রান্তিক জনগনের উন্নতির যেমন স্বপ্ন দেখে, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মকেও চ্যালেঞ্জ জানায়।সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে যেমন কাজ করে তেমনভাবেই তার বাইরে বেরিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিজেদের কাজকে বিস্তৃত করে থাকে।এ পর্যন্ত তাদের কাজের প্রণালি ,কাজের ক্ষেত্র এবং কাজের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নিয়ে বহু লেখালেখি ও গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে।সেগুলোর কয়েকটির উল্লেখের আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রথমেই যে লেখাটির উল্লেখ করা যায় সেটির নাম ''বিকল্পের সন্ধান ও এনজিও, ডঃ সুজিত সিনহা''।তিনি মূলত ''এনজিও এবং তাদের মতবাদ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।শিল্প সভ্যতার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এনজিও সংস্থার উৎপত্তির পাশাপাশি কিভাবে এই সংস্থার আবির্ভাব হল সেই প্রসঙ্গে ব্যখ্যা করেছেন।ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র নিয়ে গোটা পৃথিবী জুড়ে যে দ্বন্দ্ব ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলে আসছিল সেটির প্রতি নীতিবাচক মনোভাবই পোষণ করেছিলো এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি।এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে,

ধনতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র উভয়েরই পৃথক পৃথক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা অধিকাংশ এনজিও প্রতিষ্ঠানই স্বীকার করেনি।

তিনি আলোচনার প্রাক্কালে এনজিও প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি সংগঠন বলে উল্লেখ করেছেন পূর্বে যাদের নাম ছিল Voluntary Organisation বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ।এছাড়াও তিনি মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারত কিংবা পৃথিবীর অন্যত্র এনজিও সম্পর্কে কেবলমাত্র একটি মতবাদ থাকা সম্ভব নয়।বিভিন্নতার বহু বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান।

এনজিও প্রসঙ্গে United Nations Development Programme এর Human Development Index Report এর উল্লেখ কিংবা র‍্যাচেল কার্সনের ''The Silent Spring'' এর প্রসঙ্গ টেনে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে যেমন তুলে ধরেছেন অন্যদিকে ১৯৭০ সালের পর থেকে ভারতবর্ষেও এনজিও কার্যকলাপ যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তারও আলোচনা লেখক করেছেন।একইসাথে পশ্চিমবঙ্গে ৭ ও ৮ এর দশকে বেড়ে ওঠা এনজিওর উল্লেখ তার আলোচনায় স্থান পেয়েছে।পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'Tagore Society For Rural Development' যেটি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ও উড়িষ্যা তিন রাজ্যেই কর্মরত ছিল, আলোচনার পাশাপাশি শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর লোকশিক্ষা পরিষদ, উত্তর ২৪ পরগনার স্বপন মুখোপাধ্যায়ের Centre For Communication And Development প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

এনজিও কে দেখা হচ্ছে বিকল্প উন্নয়নের ধারক ও বাহক হিসেবে।এই আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলছেন,শিল্প সভ্যতার প্রতিষ্ঠানগুলি ,যার মধ্যে আছে ক্ষমতাসীন সরকার,বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, ইত্যাদি – তাদের উন্নতির সব রকম সদিচ্ছা থাকলেও শুধু নিজেদের উদ্যমে পর্যাপ্ত উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে এরা অক্ষম।অতএব যারা বিকল্প উন্নয়ন ও প্রগতি আনতে চাইছে তাদেরকে এই সরকারি ব্যবস্থা কাঠামোর বাইরে থাকতে হবে।আর সে জন্যই স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে।

তবে তিনি এও বলেছেন যে, এই বিকল্প মতবাদে অতি অল্প সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করেন।ডান ও বাম সব রাজনৈতিক দলই শিল্প সভ্যতাতেই বিশ্বাসী; পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই সরকারি আমলা, পুঁজিবাদী, ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত চাকুরে, শিক্ষককুল, চাষি, কারখানার শ্রমিক, কেউই বিকল্পে বিশ্বাস করেনা।

অর্থাৎ এই অংশের সাথে এনজিওদের দ্বন্দের বিশেষ জায়গা বর্তমান। এছাড়া এনজিওদের নানা রকম সমস্যার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, যে অংশে বলা হয়েছে স্পষ্ট

মতবাদের অভাবে তাদের দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচীর অভাব দেখা যায়। এদের রাজনৈতিক দল এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রতি অগ্রাহ্যের মনোভাব লক্ষ্য করা যায় ।সরকারের সহিত যৌথভাবে কাজ করতে গিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্রের জায়গা হারিয়ে ফেলে। তিনি আরও বলেছেন যে টাকা পয়সার অন্যতম মাধ্যম হল বিদেশী অনুদান লাভ কিন্তু সব এনজিও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই কি এটি প্রযোজ্য সে সম্পর্কে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়।অপেক্ষাকৃত বড় মাপের এনজিওর সাথে বিদেশি সংস্থার সহযোগিতার জায়গার প্রশ্নে তুলনামুলকভাবে ছোট ও মাঝারি মাপের এনজিওর ক্ষেত্রে এই ধারণা সর্বদা সত্য নয়।

এর পাশাপাশি তিনি বিকল্প মতবাদের ব্যখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কিংবা প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নতুন যেসব কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে তার মধ্যে থেকে এমন বিষয়গুলিকেই গ্রহন করতে হবে যেগুলি শিল্প সভ্যতার প্রবাহের বাইরে বেরিয়ে কেবলমাত্র সঠিক বিকল্পকে সূচিত করবে।

বিকল্প সম্পর্কে যেহেতু নির্দিষ্ট কোন মতবাদ নেই এবং প্রত্যেক দেশের,অঞ্চলের সামাজিক ,রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আলাদা প্রকৃতির ফলত কোন পরিস্থিতিতে কোন 'বিকল্প' মতবাদের প্রয়োগ যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত হবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাঁর লেখায়।

দ্বিতীয়ত , এনজিওর আলোচনায় যে বইটি অবদান রেখেছে সেটি হল 'Azeez Mehdi Khan, SHAPING POLICY:Do NGOs Matter? Lessions from India'।বইটিতে যে সমস্ত বিষয়ে লেখক মূলত আলোচনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল ভারতবর্ষে এনজিওর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের এনজিও কার্যকলাপের গতিপ্রকৃতি, এনজিওর সাথে রাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্পর্কের ধারা,রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রভাবের ক্ষেত্রে এনজিওর ভূমিকা, নীতির প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এনজিও দ্বারা গৃহীত প্রয়োজনীয় উদ্যোগের আলোচনা প্রভৃতি।

উক্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে তিনি কতোগুলো কেস স্টাডির অবতারনা করেছেন। এগুলো হল 'SEARCH' and the Anti-liquor Campaign in Gadchiroli District, The Cooperative Foundation and a new law for cooperatives in Andhra Pradesh, 'Gram Vikas' and NGO/Community access to wastelands for afforestation in Orissa,The National Committee's campaign for a comprehensive law for construction labour, 'SPARC' and the urban poor;advocacy processes ইত্যাদি।

মূলত এই লেখার মধ্যে দিয়ে এনজিও সংগঠন গুলি সরকারি নীতিকে কিরূপে প্রভাবিত করে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।কেবলমাত্র তাই নয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান সমুহের 'নীতি ওকালতি' প্রসঙ্গে ধারণা বৃদ্ধিতেও লেখাটি সচেষ্ট হয়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,১৯৯৩ সালে UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM প্রকাশিত 'Human Development Report' অনুযায়ী এনজিওতে উপস্থিত যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল ''নীতি সমূহকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা'' যাকে অন্য ভাবে বলা যায় ' Policy Advocacy' ।আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন কোয়ালিশন এবং সংগঠন যেমন Amnesty International ও Green Peace Organisation এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্ব রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়।

বিশ্বায়ন বিরোধী যেসব আন্দোলন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত হচ্ছে তাতে এনজিওরা বড় অংশীদার।আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ব ব্যাঙ্কের নীতি বিরোধী আন্দোলন , ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম গঠন, উন্নয়নশীল দেশের ঋণ মকুবের আন্দোলনের ফলে গ্লোবাল এইডস ফান্ড গঠন , পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন , নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলন ,শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করা থেকে শুরু করে অনেক সরকারী ও আন্তর্জাতিক নীতি পরিবর্তনে এনজিও প্রতিষ্ঠান সমূহ অন্যদের সাথে সমান ভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।অর্থাৎ এরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে উদাহরন সৃষ্টি করছে আবার আন্দোলনও সংগঠিত করছে।

কিন্তু লেখক যে বিষয়টি নিয়ে ভাবিত তা হল বড় এনজিও যেভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি পরিবর্তনে সক্রিয় ভুমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে,অপেক্ষাকৃত ছোট উন্নয়নমূলক এনজিও সংস্থা , সমপ্রকৃতির অন্য কোন দল,ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা বৃহৎ কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে দারিদ্র্যমুখী সরকারী নীতিকে কিংবা দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন প্রকল্প প্রান্তিক জনগণের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে.সেই বিষয়ে কতখানি প্রভাব বিস্তার সম্ভব ?"কার্যকরী ওকালতি'' বলতে আদতে কি বোঝায়?বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান সমসাময়িক ভারতবর্ষের সরকারী নীতির পরিবর্তনে কিভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং কতোটা সাফল্য পেয়েছে? কয়েকটি ঘটনার উল্লেখের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি তার আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

এনজিও প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একদিকে গান্ধিয়ান এনজিও'র উল্লেখ যেমন করেছেন, একইসাথে Self-Emplyed Womens Association ,Promotion of Wasteland Development (SPWD), Society for Participatory Research in Asia (SPARC), Foundation

for the Revitalization of Local Health Traditions(FRHLT) প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। সমস্যা হল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনুদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন বহু এনজিওর জন্ম হয়েছে যাদের কোন আইনগত স্বীকৃতি নেই। CAPART ৫৬৪ এরও বেশি এনজিও প্রতিষ্ঠানকে বেআইনি প্রতিপন্ন করেছে এবং এ বিষয়ে VANI র অভিমত হল এরা প্রকৃত অর্থে 'এনজিও' ই নয়।কেবলমাত্র ছোট এনজিও যে একাজে যুক্ত তা কিন্তু নয়,অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠানও এই বেআইনি কাজে লিপ্ত যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।

নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং একইসাথে পরোক্ষ হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে লেখক আলোচনা করেছেন এবং রাষ্ট্রের সাথে এনজিওর বিরোধের জায়গাও তুলে ধরেছেন।ব্যাখ্যার সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি চার প্রজন্মের এনজিওর ধারণা তুলে ধরেছেন যেখানে ম্যাক্রো পর্যায় থেকে মাইক্রো পর্যায়ের এনজিওরা স্থান পেয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ থেকে আরম্ভ করে গণ অংশগ্রহণ ,গনতন্ত্রের প্রসার কিংবা সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রয়াসে ভারতীয় এনজিও প্রতিষ্ঠান সমূহ যেসব ক্ষেত্রে সরকারী নীতি পরিবর্তনে সচেষ্ট সেগুলি তার মতে, শিশু শ্রমের বিলোপসাধন, প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা, মহিলাদের এক বিরাট অংশের অধিকার সুরক্ষা, পরিবেশ ও বন সম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু, স্বাস্থ্য, বিচার প্রক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতা, ক্রেতা সুরক্ষা, উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগ, শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র অংশের মানুষদের বাসস্থান জনিত সমস্যা প্রভৃতি।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বেশ কয়েকটিতে এনজিও কর্মকাণ্ড যে সাফল্যের নজির রেখেছে তার উল্লেখও লেখক করেছেন। যেমন SEARCH এর নেশা বিরোধী আন্দোলন কিংবা অন্ধ্রপ্রদেশে সংগঠিত সমবায়গুলির স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন ইত্যাদি।এর পাশাপাশি উড়িষ্যায় বন সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে 'গ্রাম বিকাশ' এর ধারনার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা হচ্ছে সে বিষয়েও এনজিও প্রতিষ্ঠান সরব হয়েছে।সরকারি নীতি জনগনের অপর নেতিবাচক কোন প্রভাব ফেললেও প্রতিবাদে এনজিও সংস্থার পাশাপাশি সাধারন মানুষও আন্দোলন সংগঠিত করছে যা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

তবে লেখকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে যে বিষয়টির উপস্থিতি অধিকমাত্রায় লক্ষ্য করা যায় তা হল, সরকারী নীতি পরিবর্তনে নিযুক্ত যে কয়েকটি এনজিওর উল্লেখ তিনি করেছেন তার অধিকাংশই বড় মাপের এবং নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রেও এক বিশেষ অংশের মানুষের উপস্থিতিই পরিলক্ষিত হয়,প্রান্তিক ,সাধারন গণ-অংশগ্রহণের হার তুলনামূলক কম ।এই বিষয়টিতে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়।

তৃতীয়ত যে বইয়ের উল্লেখ করবো সেটি হল Myron Weiner এর 'The Child and the State in India:Child Labor and Education Policy in Comparative Perspective'। সমসাময়িক কালে Right to Education অনুযায়ী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সব শিশুর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে । ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সব শিশুর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্তিকরণ পূর্বের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যালয় ত্যাগের সমস্যা রয়ে গেছে যার একটা দিক হিসাবে শিশু শ্রমের উৎপত্তি ঘটছে বলে লেখকের অভিমত। কয়েকটি কেস স্টাডির মধ্যে দিয়ে তিনি তার লেখায় দেখিয়েছেন যে মূলত অশিক্ষার ফলে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী না হওয়ার দরুন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।উদাহরন স্বরূপ তিনি ব্যাঙ্গালোরের সিটি মার্কেট , সেকেন্দ্রাবাদের পথ শিশু এবং ফিরোজাবাদের গ্লাস ফ্যাক্টরির শিশু শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করেছেন।কিন্তু ভারতের মতো জনবহুল উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শিশু শ্রমের উৎপত্তির অন্যতম কারন হিসাবে 'দারিদ্রতা'কে তিনি অস্বীকার করেছেন।রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলেও সেটির বাস্তবায়ন সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা কতখানি সম্ভবপর হচ্ছে তা নিয়ে দ্বিমত বর্তমান।সুতরাং আইন থাকলেও আইনের সঠিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে। দুটি বিষয়ের অন্তর্নিহিত সম্পর্ককে লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার বইয়ে।তবে এ ক্ষেত্রে আমার অভিমত হল এর বিকল্প কি হতে পারে তার সুস্পষ্ট ব্যাখার অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নমালা

উক্ত গবেষণার অন্তর্গত বিবরণ এনজিও সম্পর্কিত ধারণার পাশাপাশি জনমানসে বিভিন্ন এনজিওর কার্যকলাপ প্রসঙ্গে স্বচ্ছ বর্ণনা প্রদান করবে। একই সাথে এনজিও সংগঠনগুলি বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার ও উপভোক্তার পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত কিরূপ সহযোগিতার বিস্তার ঘটিয়েছে তারও একটা আভাস পাওয়া সম্ভবপর হবে। গবেষণার কাজে মূলত যে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসছে সেগুলি হলঃ

(ক) কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে এনজিও সংস্থাসমূহ তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকে?

(খ)সরকারের সহিত এনজিও প্রতিষ্ঠানসমুহের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কিরূপ?

(গ) সমসাময়িক কালে এনজিও কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে উপভোক্তারা কতখানি উপকৃত হয়েছেন?

গবেষনা নকশা

যে কোন গবেষণামূলক কাজ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরিচালনা করা উচিত। প্রতিটি গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কয়েকটি পর্যায় অনুসরন করতে হয়। গৃহীত পর্যায় সমূহ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সেগুলি Hypotheses বা প্রতিকল্পের বিশ্লেষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। গবেষণা নকশা তৈরির সময় গবেষণার প্রশ্নমালার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি যাতে না হতে হয় গবেষককে সেই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

গবেষণার সমস্যা মনোনয়ন থেকে শুরু করে,প্রতিকল্প গঠন, তার বিশ্লেষন, গবেষণার উপায় সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহন,পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংগ্রহের সময় প্রয়োজন হলে সমীক্ষা পদ্ধতির ব্যবহার অথবা নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ, তথ্য সংকলন, বিশ্লেষণ, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান যাচাই করা সবটাই গবেষণা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে তাৎপর্যে উপনীত হওয়া এই প্রক্রিয়াভুক্ত।ফলত এই নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ না করে যথাযথ ভাবে গবেষণা সম্পাদন সম্ভব নয় এই বিষয়টি অবশ্যই গবেষককে মাথায় রাখতে হবে।

প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎসের ওপর ভিত্তি করে উক্ত গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। গৌণ উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বই,জার্নাল ,সংবাদপত্রের কয়েকটি প্রতিবেদন এবং আরও কিছু প্রকাশনী। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও আইন , প্রশ্নাবলীর মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত এলাকাভিত্তিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি ও সাক্ষাৎকারীদের বিশেষ সহযোগিতার মাধ্যমে অন্তিম পর্যায়ের গবেষণা নকশা তৈরি করা হয়েছে।

সমগ্র গবেষণা ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পাদিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এনজিও সম্পর্কে ধারণা

এনজিও শব্দদ্বয়ের সাথে কম বেশি সকলেই পরিচিত। এনজিও সংস্থার গঠন প্রণালী কিংবা তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে কয়েকটি সাধারন মতবাদও পরিলক্ষিত হয়। মূলত সংস্থা গুলির উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে নানা ধরনের প্রশ্ন জড়িত। এদের গঠন, কর্মক্ষেত্রের পরিধি, কার্যাবলীর বিভিন্ন ধরনকে মাথায় রেখে এনজিও গুলির শ্রেনিবিভাগ করা হয়ে থাকে। তবে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে প্রথমেই মাথায় আসে তা হল এনজিও বলতে কী বোঝায, সরকারি নীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে অকস্মাৎ এনজিওর প্রয়োজনীয়তার কথা কেন অনুভূত হোল ?

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে গেলে অতীতের কিছু বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন। প্রথমেই বলা যায় শিল্প সভ্যতার অগ্রগতি এবং তার ফলাফল হিসেবে বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র লাগাম ছাড়া অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এরই পাশাপাশি অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রই হোল অন্য যে কোনও রাষ্ট্র অপেক্ষা উন্নত এবং শক্তিশালীও বটে।আর এই লক্ষ্য পূরণের তাগিদেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব ও রেষারেষির উৎপত্তি হয়েছে যার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিয়েছে অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা[1]।

প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির ওপর এবং আরও বিস্তারিতভাবে বলা যেতে পারে ইকোলজি বা বাস্তুতন্ত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে মূল প্রাকৃতিক উপাদান সমূহ যেমন জল, বায়ু, মাটির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে যার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিয়েছে পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণ মানুষ সহ গোটা বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গ্রিনহাউস এফেক্ট সৃষ্টিকারী বিভিন্ন গ্যাসের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ফলাফল হিসেবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর ভবিষ্যৎ পরিণতি যে আরও খারাপ আকার ধারণ করবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নের জোয়ার এলেও সব রাষ্ট্রের সমান সংখ্যক মানুষ উন্নয়নের শরিক হতে পেরেছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়না। শিল্প

[1] Khan,Azeez Mehdi.(1997),*Shaping Policy:Do NGOs Matter*?,New Delhi:Participatory Research in Asia

সভ্যতার প্রসারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যেমন অগ্রগতি হয়েছে অনুরূপভাবে বিশ্বায়ন ও আধুনিকীকরণের প্রভাবে বর্তমান বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু মূল সমস্যা হোল তাতে সব স্তরের মানুষ সমান ভাবে লাভবান হচ্ছেনা।মুষ্টিমেয় অংশের হাতেই যাবতীয় ধন সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে।আর অন্যদিকে পর্দার আড়ালে অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে যাচ্ছে অন্য স্তরের বঞ্চিত মানুষের দল। প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক মানুষ আরও বেশি পরিমান সম্পত্তি নিজেদের অধীনস্থ করার চেষ্টায় রত। ফলত নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষগুলোর জীবন কিংবা জীবিকা নির্বাহই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।অথচ প্রকৃতি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর উভয়েরই সমান অধিকার।তাহলে সমস্যার সমাধান সূত্র কোথায়? সাধারণ মানুষেরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অধিকার আদায় করার মাধ্যম কি? তাদের জীবনযাত্রার মানোয়ন্নন কিরূপে সম্ভব? কিভাবে সামাজিক সমতার নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে?এনজিও সংগঠনগুলো মূলত পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক,অনগ্রসর ,বঞ্চিত মানুষদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে।

<u>প্রেক্ষিত</u>

এবার খানিকটা অতীতের আলোচনায় চোখ ফেরানো যাক।আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আবির্ভাবের পরবর্তী সময় থেকে বিশ্বের বহু রাষ্ট্রই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী অনুসরণ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির উন্নয়নের সমস্যাটি আন্তর্জাতিক দুনিয়ার এক নতুন সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের পটভূমিকায় ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের সমস্যাটি পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির কর্মসূচীর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

যুদ্ধের অবসানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান চারদফা কর্মসূচীর প্রবর্তন করেন যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে ,অর্থনৈতিক গতি সঞ্চার করা। তার মত অনুযায়ী উন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল শিল্পায়নের ধারাকে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া এবং একইসাথে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার পরিচ্ছন্ন ন্যায় ব্যবহারকে এই দেশগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা।

কিন্তু সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির সামাজিক,রাজনৈতিক,এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত। অন্যদিকে, দীর্ঘকাল যাবত ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে অর্থনীতিও ছিল ভগ্নপ্রায়। আন্তর্জাতিক স্তরে ধনতন্ত্রের যত বিকাশ ঘটেছে এইসব অঞ্চলের পরিস্থিতি ততই খারাপ হয়েছে। এই বিকাশের ফলে, একদিকে অনুন্নত দেশসমূহে সৃষ্টি হয়েছে বহু বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাভোগী ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণির। এরই পাশাপাশি অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে প্রান্তিক শ্রেণিগুলি।

অন্যদিকে, বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার কার্যকলাপ অনুন্নত দেশগুলিতে আরও অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি করেছে এবং এই দেশগুলির ধনী শ্রেণিকে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস করে অথবা নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে অনুন্নত দেশগুলিতে স্বাধীনভাবে ধনতন্ত্রের বিকাশকে ব্যহত করেছে। দেখা যাচ্ছে অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্র ও প্রান্তিক স্তরের মধ্যেও তীব্র বিভাজন বর্তমান। এই বিভাজন দূরীকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সামাজিক অসাম্য দূরীকরণও ছিল এই উদ্যোগেরই অংশ। তবে এই উদ্যোগ বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সরকার তার ঘোষিত লক্ষ্য পূরণে নানাভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ব্রাজিলীয় অর্থনীতিবিদ সেলসো ফুয়ারদোর উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের ধারনার অবতারনা করা যেতে পারে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, তৃতীয় বিশ্বে এক নতুন ধরনের শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে, এই শ্রেণী পিরামিডের শীর্ষে আছে বহিঃবানিজ্যের সঙ্গে জড়িত জমিদার গোষ্ঠী, রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী গোষ্ঠী ও স্থানীয় বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদীগণ। দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত হলেন শহরের বেতনভুক্ শহরবাসী,মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণি। সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে কৃষক শ্রেণি। উদ্ভাবনী শক্তির অনুপস্থিতির জন্য প্রান্তিক ধনতন্ত্র স্থানীয় উন্নয়নের জন্য বিদেশী পুঁজি ও বহির্দেশীয় সিদ্ধান্তের ওপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল।ফলত এখানেও বিদেশি প্রভাব যেমন রয়েছে একই সাথে অভ্যন্তরীণ অসাম্যও বর্তমান। এমতাবস্থায় সামাজিক অসাম্য দূরীকরণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। তবে তা কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা বিতর্কের বিষয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তি হলেও জাতীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতির মধ্যে অসম ব্যবস্থা যে রয়ে গেছে সে কথা জোর দিয়ে বলা যায়।মূলত বিদেশী শক্তির প্রভাব মুক্তি ঘটলেও অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও বহির্দেশীয় সম্পর্কের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। উক্ত রাষ্ট্রসমূহে গড়ে উঠেছে এক বা একাধিক

কেন্দ্রস্থল যা উক্ত রাষ্ট্রভুক্ত প্রান্তিক অঞ্চলসমূহকে শোষণ করে নিজস্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। এর ফলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নের উদ্যোগ গৃহীত হলেও তাতে প্রান্তিক মানুষদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছেনা। তারা যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার এই দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে মুলত এনজিও সংস্থার উৎপত্তি।শুধু তাইই নয়, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডের জন্যও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এনজিও সংস্থাগুলি এক তাৎপর্যপূর্ণ জায়গায় অধিষ্ঠিত।রাষ্ট্রীয় পরিসীমার বাইরে গিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও এটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় নীতি ব্যতিরেকে এই সংস্থাগুলি নিজস্ব নীতির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এই কর্মকাণ্ডে সাধারন মানুষের প্রবেশ অবাধ এরই পাশাপাশি সংস্থার অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ উপস্থিত থাকার দরুন সাধারন মানুষ অতি সহজেই নানা রকম সামাজিক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে এই বেসরকারি সংস্থায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকার অর্থ এই নয় যে সেখানে কোনরকম নিয়ম কানুন থাকেনা।পৃথক পৃথক সংস্থায় নির্দিষ্ট নিয়মাবলী কিংবা শর্ত মেনে সদস্যপদ প্রদানের সুবিধা রয়েছে। শুধু তাই নয় সদস্য পদ লাভের পর সংস্থাগুলির বিভিন্ন কর্মসূচী র বাস্তবায়নেও নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও রীতিনীতি মেনেই তাদের অগ্রসর হতে হয়।

তবে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার পূর্বে প্রথমেই এনজিও প্রসঙ্গে ধারনার অবতারনা করা প্রয়োজন।এনজিও শব্দদ্বয় বলতে আমরা কি বুঝি, এর উৎপত্তি, বিবর্তনের ইতিহাস,স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অথবা সংস্থার বিভিন্ন কার্যাবলী প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

এনজিও শব্দের উৎপত্তি খুব বেশিদিনের নয়।প্রাথমিকভাবে 'সংস্থা' শব্দটির সাথে কম বেশি সকলেই পরিচিত।সমাজস্থ অধিকাংশ মানুষই কোনও না কোনও সংস্থার সাথে যুক্ত তা সে শিল্প প্রতিষ্ঠান , কর্মক্ষেত্র কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেখানেই হোক না কেন। সাধারণভাবে Non Governmental Organisation এর বাংলা করলে দাঁড়ায় বেসরকারি সংগঠন। তবে এই আক্ষরিক অর্থ থেকে অবশ্য খুব বেশি কিছু বোঝার উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে জন ক্লার্ক এর উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে।তিনি তার "ডেমোক্রেটাইজিং ডেভলপমেন্ট"[2] গ্রন্থে বলেছেন "সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এনজিওর আবির্ভাব।এনজিওরা,তার মতে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বৈপ্লবিক

[2] মুখোপাধ্যায়, অমিতেশ. (২০০৫),"একটি অভিজ্ঞতার গল্পঃ এনজিও কতটা রাজনৈতিক *", উন্নয়নের খোঁজে এনজিও* ,কলকাতাঃডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার ,পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮

পরিবর্তন এনেছে। আশির দশক থেকে একটা ধারণা শিকড় গেড়েছে যে তৃণমূল স্তরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা সক্রিয় হওয়ায় প্রথাগত নিম্নগামী উন্নয়নের ধারণা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। "তবে প্রশ্নের জায়গা হল বঞ্চিত গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেরা কতখানি উন্নয়ন এর রাস্তা তৈরি করতে পারছে। এক্ষেত্রে এনজিও সংগঠনগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

এনজিওর সংজ্ঞা

১৯৯৬ সালে এনজিওর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট বলছে, এনজিও হলো সেই গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান যারা রাষ্ট্র বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং যাদের উদ্দেশ্য মানবিক, বাণিজ্যিক নয়।

অন্যদিকে কিছু অংশের তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, আদর্শ সমাজের লক্ষ্য এবং সেখানে পৌঁছানো এই পথের সন্ধান এই মূলত এনজিওরা অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। কারণ এরা মনে করছেন যে ,শিল্প সভ্যতার অগ্রগতির ফলাফল হিসাবে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটেছে যে গুলির মধ্যে অন্যতম হলো সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পৌরসভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদি। এদের মধ্যে উন্নতির সব রকম ইচ্ছা থাকলেও শুধু নিজের উদ্যমে পর্যাপ্ত উন্নয়ন এবং বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। কাজের ক্ষেত্রে নানা রকম বিধিনিষেধ এর মধ্যে থেকে পর্যাপ্ত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। আর এই উন্নয়ন সাধারণ মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। ফলতঃ যারা সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে চাইছে তাদের অবশ্যই সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে হবে।এই লক্ষ্যেই গড়ে উঠেছে একদল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যারা একদিকে সামাজিক ন্যায় এর বাস্তবায়ন যেমন চাইছে তেমনি পাশাপাশি অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে ও সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মানসিকতা না থাকার দরুন ক্ষমতা লাভের জন্য কোনরকম প্রতিযোগিতাও তৈরি হচ্ছে না। এই বিষয়গুলি তাদের কার্যকলাপ কে অনেকটাই সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিচ্ছে।

তবে এত কিছু বাদ দিয়ে এনজিওর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বলা যায় মূলত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সমবেত স্বার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী মানুষদের দ্বারা সংগঠিত সংস্থাই হোল এন জিও এর মূল ভিত্তি। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া মানে বেসরকারিকরণ কে বোঝানো যায় তবে বেসরকারি সংস্থা মানেই এনজিও সংস্থা

তা কিন্তু নয়।বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লাভের একটা সম্পর্কের জায়গা রয়েছে।অন্যদিকে এনজিও সংস্থা প্রসঙ্গে বলা হয় এটি অলাভজনক সংগঠন।"লাভ" বিষয়টির সাথে বাজারের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যদিও দুয়েরই অবস্থান সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।এছাড়াও সরকারি পরিসরের বাইরে অবস্থান করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন কিংবা কোনো ব্যবসায়ী সংগঠন যারা নিজস্ব পরিসরের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে, ফলত এখানে লাভের একটা প্রবণতা আছে।কেবলমাত্র তাই নয় এদের রাজনৈতিক যোগসুত্রও যে বর্তমান সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এবং বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকারি কার্যকলাপ দ্বারা তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।উল্টো দিকে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের গতি সঞ্চারের লক্ষ্যেই এনজিওরা অধিক উৎসাহী।

তবে কোনো রকম লাভের আশা না করেই এনজিওরা যদি সামাজিক ন্যায়ের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবার একটা ধারণা ফুটে ওঠে।কিন্তু সব সেচ্ছাসেবী সংস্থাই যে এনজিও তা কিন্তু নয়। এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্য রেখা বর্তমান। সাধারণত এনজিও নন প্রফিট অরগ্যানাইজেশন নামে অর্থাৎ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিগণিত। এনজিওর অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন মহিলাদের সহায়তা প্রদানকারী সংগঠন , শিশু সুরক্ষা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন সংগঠন, আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংগঠন প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে কিংবা বাইরের সাধারন মানুষদের জীবনের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করাই এদের মূল লক্ষ্য। তবে শুধু অধিকার পাইয়ে দেওয়া বললে ভুল হবে সামাজিক সচেতনতার উন্মেষ ঘটাতেও এনজিও বদ্ধ পরিকর। সুতরাং এই লক্ষ্য পূরনে এনজিও গুলির নিজস্ব কায়েমি স্বার্থের প্রতি বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই এই বিষয়টি স্পষ্ট। এখানে লাভ বা ক্ষতির প্রশ্ন আসছেনা। সমষ্টির স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে এনজিও সংস্থা সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা নিজেদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলেই দাবি করে।

বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যাবে অতীতের অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের স্রোতে সামিল হয়েছে এন জিও সংস্থা গুলিও। প্রাথমিক ভাবে এই সংস্থা গুলিকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান মনে করা হলেও এই চিন্তাধারার খানিক রতবদল ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাসেবামূলক পরিষেবার নাম করে এন জিও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলেও এর পশ্চাতে ব্যবসায়িক স্বার্থও লুকিয়ে রয়েছে । এভাবে বহু সংখ্যক এন জিও বর্তমান সময়ে নিজেদের কর্মসূচীকে বাণিজ্যিক অভিমুখে পরিচালিত করে চলেছে। ফলে তাদের

কার্যকলাপের মধ্যে কতখানি স্বেচ্ছাসেবক মূলক মনোভাব রয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

এবারে আসা যাক সেচ্ছাসেবী সংস্থা বা Voluntary Organisation বলতে আমরা কি বুঝি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ল্যাতিন শব্দ 'Voluntas' থেকে 'Voluntarism' শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ হোল 'Will' অর্থাৎ 'ইচ্ছে' । উৎপত্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রাচীন কিংবা মধ্য যুগে 'Voluntarism' এর ধারণা বর্তমান ছিল। যদিও তার উৎস ছিল এই ধারণা অপেক্ষা ভিন্ন। ধর্মীয় কর্তব্যের অংশ হিসেবে 'Voluntarism' কে দেখা হতো। ধর্মীয় অনুশাসন পারস্পরিক সহযোগিতা , সহমর্মিতা, দুঃখমোচন প্রভৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিত যার থেকেই 'Voluntarism' এর ধারনার উদ্ভব বলে তাত্ত্বিকদের একাংশ দাবি করে থাকেন। অন্যদিকে এনজিও কার্যকলাপ বলতেই কেবলমাত্র স্বেচ্ছাসেবামুলক কর্মসূচী বোঝায় তা কিন্তু নয়।

তবে 'Voluntary Organisation' (VO) কিংবা NGO যাই হোকনা কেন নির্দিষ্ট আইন মেনেই তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যদিও কয়েকটি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী , বহু সংখ্যক এন জিও কোনও রকম আইনগত স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই প্রান্তিক স্তরের মানুষদের জন্য কাজ করে চলেছে। তবে "স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা" অপেক্ষা এনজিও সংস্থার সংখ্যা অনেক বেশি এবং একইসাথে এনজিও দের কর্মকাণ্ডের পরিধি VO অপেক্ষা বহুদূর বিস্তৃত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় সমস্ত সেচ্ছাসেবামুলক কর্মকাণ্ড এন জিও কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত হলেও এন জিও সংস্থার সব কাজই স্বেচ্ছাসেবামূলক তা কখনওই নয়। বহু সংখ্যক এন জিও র কর্মকাণ্ডের ব্যপকতা তাদেরকে Voluntary Organisation থেকে পৃথক করেছে।

<u>এনজিওর বৈশিষ্ট্য</u>

(ক) সাধারনত এনজিও সংস্থা ব্যক্তিগত স্বার্থের বাস্তবায়নের মঞ্চ নয়। এনজিওর কর্মীরা কখনও স্বেচ্ছায় এই কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হন আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট বেতনের ব্যবস্থা করা হয়।তবে যাই হোক না কেন সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জায়গা অনুপস্থিত।

(খ) মূলত স্বেচ্ছাসেবামূলক মনোভাব নিয়েই এনজিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।এদের কার্যকলাপের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় কাজ করার মানসিকতা সেখানে বর্তমান।

(গ) তৃতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সমাজে উপস্থিত অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কিংবা রাজনৈতিক সংগঠন থেকে এরা পৃথক।কাজের ক্ষেত্রে এরা নিজস্ব নীতি ও নিয়ম কানুন

অনুসরন করে থাকে। সংস্থা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পৃথক 'প্রশাসনিক কাঠামো" যেমন বর্তমান তেমনই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিধির ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত পদ্ধতি অনুসরন করা হয়ে থাকে এবং সেই মতো যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা হয়।

(ঘ) চতুর্থত, এরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।সরকার,বেসরকারি সংগঠন, রাজনৈতিক দল কিংবা অন্য কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা চালিত নয়।সংস্থার নিজস্ব নীতি মেনেই যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং সংস্থার অভ্যন্তরে একপ্রকার গণতন্ত্রের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয় যাতে কর্মীরা নিজেদের মতো করে কাজ করতে সক্ষম হন।

(ঙ) এন জিও সংস্থার আইনগত স্বীকৃতি রয়েছে। যে কোন এন জিওই হোক না কেন অবশ্যই তাদের Societies Act এবং কিছু ক্ষেত্রে Trade Union Act এর অধীনে নথিভুক্তিকরন থাকতে হবে। একইসাথে সব এন জিওই Ministry Of Home Affairs,Government Of India এর Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) এর আওতাধীন। বিদেশি অনুদান লাভের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অনুসরন করা বাধ্যতামূলক।

(চ) সাধারনত এনজিওর কাজ নমনীয় প্রকৃতির।

(ছ) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন এনজিও এর আর একটি বৈশিষ্ট্য। সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিচার করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং একই সাথে সেগুলির সঠিক বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। যত দ্রুত জনগণকে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে ততই ভাল সুতরাং সমান্তরালভাবে কাজের ক্ষেত্রে যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার যথা সম্ভব সমাধান সাধনের চেষ্টা করা হয়।

(জ) এনজিও একপ্রকার অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। কোন প্রকার লাভের হিসাব করে এই সংস্থা গুলি কাজ করেনা। কর্মসূচী র বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপার্জন হলেও তা সংস্থার সদস্য কিংবা সংস্থার সহিত যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করার নীতি অনুসরন করা হয়ে থাকে।

এনজিও কর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন।সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের সংগঠিত করা থেকে শুরু করে কর্মসূচী র সফল বাস্তবায়ন পর্যন্ত এই কাজের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে এনজিও কর্মীদের মনে উচ্চ মুল্য বোধের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। তারা সমাজের যে অংশের জন্য স্বেচ্ছায় কাজ করছেন অর্থাৎ দরিদ্র, অনগ্রসর

মানুষদের জন্য, সেটি নিঃসন্দেহে যে মহৎ কাজ সেই বিষয়ের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে কাজের প্রতি আরও বেশি মাত্রায় আকৃষ্টের চেষ্টা করে সংস্থার ব্যবস্থাপন কমিটি।

নির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানবতার আদর্শের দ্বারা এন জিও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মুল্যবোধের প্রতি এক প্রকার দায়বদ্ধতা থেকে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এরা উৎসাহী।

সামাজিক প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই সংস্থাটি মূলত অনুঘটকের ভুমিকা পালন করে থাকে।জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতির চিন্তা করে।

মানুষের কল্যানের লক্ষ্যেই এনজিও র আবির্ভাব। অর্থাৎ এন জিওর প্রানকেন্দ্রে সাধারন মানুষের অবস্থান।এরা মানুষের মধ্যে দিয়ে মানুষের স্বার্থে এদের কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যে দিয়ে এন জিও সম্পর্কে সমূহ ধারণা লাভ করা গেলো। এবারে আসা যাক সমাজে কি কি ধরনের এন জিও উৎপত্তি লাভ করেছে এই আলোচনায়।

এনজিওর প্রকারভেদ

এন জিও সংস্থার কাজের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এদের শ্রেনিবিভাগ করা যেতে পারে। যেমন কয়েকটি এন জিও কেবলমাত্র স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত,কিছু আবার সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারি কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে থাকে আবার কয়েকটি এন জিও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।তবে এর মধ্যে সাধারন ভাবে যে কয়েক প্রকার এন জিওর ধারণা আমরা পেয়ে থাকি সেগুলো নিম্নরূপঃ

Charity NGO: দরিদ্রের সেবা মানে ভগবানের সেবা করা এমন এক প্রকার বিশ্বাস আমাদের সমাজে বর্তমান। এই উদ্যেশ্যে গরিব মানুষের সেবাকল্পে কিছু সংখ্যক মানুষ সমবেতভাবে এগিয়ে আসেন।এরা মূলত ট্রাস্ট নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

পরিষেবা প্রদানকারী এন জিওঃ এই কাজের মুল ভিত্তি হল জনকল্যান সাধন।এরা মূলত হতদরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষদের অগ্রগতির স্বার্থে বিভিন্ন রকমের পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসনঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা আমাদের অজানা নয়।বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ভুমিকম্প,বন্যা,মহামারী, অগ্নিকাণ্ডের পাশাপাশি মানুষ সৃষ্ট বিভিন্ন দুর্ঘটনা

যেমন যুদ্ধ, জেনোসাইড প্রভৃতির ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।এ সময় উদ্ধারকল্পে এবং ত্রাণ পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন এন জিও সংস্থা নিজেদের ইচ্ছেয় কিংবা পরিস্থিতি গুরুতর হলে সরকারি আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন- মনে করা হয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতিই সামাজিক অগ্রগতির সূচক। যেহেতু এনজিও র কার্যকলাপ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে কার্যত সেজন্যেই তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনেও অগ্রসর হয়।

ক্ষমতায়নে নিয়োজিত এনজিওঃ যেকোনো দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরনের ফলে সেখানে সাধারন মানুষের অংশগ্রহনের সুযোগ কম।ভারতের রাষ্ট্র কিংবা সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ পদস্থ অবস্থান এখনও এলিট সম্প্রদায়ের অধীনস্থ। এই বিষয়টির বিরোধিতা করে সাধারন মানুষের ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেয় এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি।

এতো গেল ক্ষমতায়নের প্রশ্ন।সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কিছু এনজিও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন করে।এরা মনে করে মানুষ আরও বেশি মাত্রায় সচেতন হলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে।

NGO Network গঠনঃ এই এনজিও উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে কিছু সংখ্যক এনজিও একত্রিত করে যৌথ মঞ্চ গঠনের চেষ্টা করা হয় এবং এর ফলে সমবেত স্বার্থের বাস্তবায়ন সহজতর হবে বলে একাংশের অভিমত।

Support NGO: এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের এনজিও সদ্য প্রতিষ্ঠিত ছোট এন জিও দের নানা রকম সহায়তা প্রদান কোড়ে থাকে।

Funding Agencies: এদের প্রাথমিক কাজ হল অপেক্ষাকৃত ছোট ও মাঝারি মাপের সংগঠনকে কিংবা কোন Support NGO কে অর্থ প্রদান করা।

Green ও Matthias (1997)[3] এনজিওর 'কার্যকলাপ' ও 'কর্মক্ষেত্রে' র ওপর ভিত্তি করে এন জিওকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন।এগুলি যথাক্রমে Service oriented NGOs.Research NGOs.Supportive NGOs. NGO for policy advocacy. Funding NGOs এবং Co-ordinating NGO। অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রের পরিধি অনুযায়ী এনজিও সংস্থা গুলি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে,জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কর্মরত বলে তিনি মনে করেন।

[3] Green,A.and Matthias,A.(1997),Non-Governmental Organisation and Health in Developing Countries,London:Macmillan Press

এবার দেখা যাক কি কি ধরনের এনজিও সংস্থা ভারতে কর্মরত। ভারতে এনজিওর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে রবিনসন (১৯৯৫) অবস্থান ও কাজের ব্যাপ্তির ওপর ভিত্তি করে সংগঠনগুলিকে ছয়ভাগে ভাগ করেছেন।এগুলি হল ১) বড় মাপের দেশীয় সংগঠন যেগুলি ভারতের একাধিক প্রদেশে কাজ করছে, ২) বড় ভারতীয় সংগঠন যেগুলো একটি প্রদেশের একাধিক জেলায় কাজ করছে, ৩)মাঝারি মাপের দেশজ এন জিও যেগুলি এক বা একাধিক গ্রামে কাজ করছে, ৪) ছোট মাপের দেশজ সংগঠন সেগুলি একাধিক গ্রামে কাজ করে, ৫)বড় মাপের আন্তর্জাতিক সংগঠন যেগুলি দেশজ এন জিও গুলিকে অর্থসাহায্য করে থাকে এবং ৬) ছোট মাপের আন্তর্জাতিক সংগঠন যারা সরাসরি আঞ্চলিক স্তরে কাজ করে। অর্থাৎ একদিকে বড় মাপের আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন আছে তার পাশাপাশি ছোট মাপের সংগঠন বা ক্লাবও অবস্থান করছে।এদের মাঝখানে রয়েছে মাঝারি মাপের সংগঠন যারা উভয় স্তরের এনজিওর সাথেই সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। প্রান্তিক স্তরে কাজ করতে গিয়ে একদিকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক প্রকল্প যেমন গ্রহন করছে তেমনই একই সাথে অন্য এনজিও দের অর্থ সহায়তাও প্রদান করছে ।আবার অনেক ক্ষেত্রে সরকারের কেন্দ্রীয় বিভাগ কিছু এনজিও কে কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়নেও নিয়োগ করছে।তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এক নজরে দেখে নেওা যাক অতীতের ভারতবর্ষে এনজিও কার্যকলাপ কিরূপ ছিল।

ভারতে এনজিওর ইতিহাস

অতীত ভারতের চিত্র অনুসরণ করলে দেখা যাবে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাসেবামূলক ধারণা বর্তমান ছিল।তবে মূলত ধর্মীয় পক্ষপাতদুষ্টতার সাথেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলো অশিক্ষিত, অনগ্রসর, ও দুঃস্থ মানুষের সেবায় নিযুক্ত ছিল। শুরুর দিকে খ্রিষ্টান মিসনারিজ গুলো উদ্যোগ নিয়েছিলো। যাদের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই লক্ষ্য পূরণে তারা নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করে। এই অঞ্চলগুলিতে অতি সহজেই মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে পরিবর্তন করা সম্ভবপর ছিল এবং এর পশ্চাতে বিশেষ কারণও বর্তমান ছিল। অর্থাভাবে, খাদ্যাভাবে, কিংবা অশিক্ষার দরুন সমাজে পিছিয়ে থাকার চেয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো জীবন যাপনকে অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলো একাংশের মানুষ। এর পাশাপাশি খ্রিস্টান মিসনারিজ গুলো তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরনের জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলোকে বেছে নিয়েছিলো। সমাজের অনান্য অংশেও এর প্রভাব পড়েছিল। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও বিভিন্ন সেচ্ছা সেবামূলক কর্মসূচী গ্রহন

করেছিল । তাদের এই কর্মসূচী বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ওপরও প্রভাব ফেলেছিল। সামাজিক পরিবর্তনে অগ্রগামী বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ হলেন রাজা রামমোহন রায় , ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর , অ্যানি বেসান্ত এবং অনান্যরা ।সামাজিক সংস্কার সাধনে এঁদের অকৃত্রিম ভুমিকার কথা অনস্বীকার্য ।

অন্যদিকে সমাজ সংস্কারে সে সব সংগঠন উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছিল তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হোল 'ব্রাম্ম সমাজ', (১৮২৮) 'পরমহংস সভা' (১৮৪৯) 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫) 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি' , এবং সর্বোপরি 'রামকৃষ্ণ মিশন'। তবে এগুলোর অধিকাংশের কার্যকলাপ মূলত স্বাধীনতা পূর্ব ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের কর্মস্থল সামাজিক জনকল্যাণ,সামাজিক পরিষেবা কিংবা রীতিনীতির মধ্যেই সীমিত ছিল। ইতিহাস অনুসরন করলে দেখা যায় , প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ব্যবস্থার সাথেই এদের সংযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি।

অন্যদিকে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলোর একাংশ খরা, বন্যা, মহামারী কিংবা বহিঃ শত্রুর আক্রমণের ফলে আক্রান্ত অঞ্চলের মানুষজনকে খাদ্য, ঔষধ,সরবরাহ করতো কিংবা পরিস্থিতি অনুসারে ত্রান শিবিরের আয়োজন করতো। এই সংগঠনগুলির উদ্যোগেই বহু ক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহ করে সাধারন মানুষের উন্নয়ন প্রকল্পে স্কুল কলেজ এবং হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে এই সময়েই। কারন অধিকাংশ সময়েই পরিস্থিতি চরম আকার ধারন না করলে সরকার বিশেষ কোন উদ্যোগ কখনওই নিতো না।

দরিদ্র, অনগ্রসর ,অসুস্থ ,বিধবা , অনাথ কিংবা অপারগ মানুষদের সাধারণ জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে এই Voluntary Organisation সমূহ সরকার অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল ভুমিকা পালন করতো।মূলত উনিশ শতকে এদের সামাজিক ভুমিকা এবং সমাজ সংস্কারক উদ্যোগ ভারতবর্ষে উন্নতির নতুন দিশা দেখিয়েছিল।

তবে পরবর্তী সময়ে মহাত্মা গান্ধী স্বেচ্ছাসেবার ধারনাকে নতুন ভাবে তুলে ধরেন।ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রাক্কালে তিনি মূলত স্বনির্ভরতার ধারনাকে গুরুত্ব দেন। গান্ধিবাদি ধারনায় প্রভাবিত হয়ে স্বনির্ভরতা কিংবা সামাজিক প্রগতি চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। স্বদেশি চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৃনমূল পর্যায়ের মানুষদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন।

গ্রামীণ স্তরে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক স্বায়ত্ত অর্জনও ছিল তাঁর কাছে ছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সর্বোপরি তিনি পশ্চিমের সংস্কৃতি থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র রাখার লক্ষ্য নিয়ে 'সেচ্ছাসেবার' ধারনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করেই গান্ধীজী জাতীয় পুনর্গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। শুধু তাইই নয় , কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে স্বয়ম শাসিত 'Village Council' এর ধারনাও ছিল এই উদ্যোগের আর একটি বড় পদক্ষেপ।অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বায়ত্তই নয় , এটি ছিল গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত এক যৌথ প্রয়াস।

স্বাধীন ভারতের চিত্র ছিল কিছুটা অন্যরকম। বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলনের ঐতিহ্য অনুসরন করে গান্ধীজী - উত্তর পর্বে নানাধরনের বেসরকারি সংগঠনের উত্থান ঘটে। শুরুর দিকে কেবলমাত্র জনকল্যাণমুখী কিংবা ত্রাণ কল্পেই এরা নিযুক্ত থাকতো।বিভিন্ন গঠনমূলক প্রকল্পে সরকারি অনুদান লাভ ছিল নিয়মিত ব্যপার।তবে ৭০এর দশক পর্যন্ত এই বেসরকারি সংস্থাগুলি সামাজিক জনকল্যাণ এবং Social Service Delivery তেই নিয়োজিত থাকলেও অচিরেই গতিপথ পরিবর্তিত হয়।

গান্ধীজী মূলত তৃনমূল স্তরের মানুষদের উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্পের বিকাশ ,খাদিশিল্পের বিবর্তন প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যদিও এগুলি প্রথম দিকে সাধারন মানুষের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকলেও একটা সময়ের পর তার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রন স্থাপিত হয়।ফলত খাদি কিংবা কুটির শিল্পের স্বাধীন বিকাশের জায়গা খানিকটা হলেও ব্যহত হয় ।

তবে বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে এগুলোর বিকাশে সরকারি ভুমিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নবগঠিত সরকার 'Community Development Program' এর শুভ উদ্বোধন করে। গ্রামীণ স্বনির্ভরতার ধারণা উপেক্ষিত হতে থাকে।আরও বিস্তারিত ভাবে বলা যায়, গ্রামীণ স্বনির্ভরতার ধারণা বিলুপ্তির পথে এগোয়।স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে Central Social Welfare Board, Khadi and Village Industries Commission ও People's Action Development India প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূলত ১৯৬০ এর দশকের শেষভাগ থেকে ১৯৭০ এর শুরুর দিকে এন জিও র বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। সরকারি নীতির কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ার ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য প্রকট হতে থাকে। খুব স্বাভাবিক কারনেই শহর ও গ্রামের মধ্যেও স্পষ্ট ব্যবধান পরিলক্ষিত

হয়। এই ব্যবধান দূরীকরণের লক্ষ্যে গান্ধীবাদী ধারনায় প্রভাবিত মানুষের একাংশ, বাম মতবাদের অনুসরণকারীরা, এবং তদুপরি খ্রিস্টান মিসনারিদের মধ্যে বিকল্প উদ্যোগের আভাস পরিলক্ষিত হয়।

প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়ন সাধনের প্রয়াসে বিভিন্ন অ-সরকারি সংস্থা এগিয়ে আসে। আমরা যদি ১৯৬০ এর দশকের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব এসময়ের দুই প্রধান সামাজিক বিষয় ভারতের রাজনীতি ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।প্রথমতো অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা, দ্বিতীয়ত দীর্ঘকাল যাবত ক্ষমতাসীন থাকা কংগ্রেস সরকারের প্রতি সাধারন মানুষের তীব্র অসন্তোষ।

ফলত রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয় এই সময়েই। গান্ধীজি প্রবর্তিত গ্রাম স্বরাজের ধারণা কিংবা আরও বিস্তারিত ভাবে বলা যেতে পারে গ্রামীণ স্বনির্ভরতার ধারণা নতুন মাত্রা পেতে শুরু করে।অন্যদিকে পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার ক্রমাগত ব্যর্থ হতে থাকে।ফলশ্রুতিতে সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সাধনের যে পরিকল্পনা করে Community Development Program তার ধারনাও গুরুত্ব হারাতে থাকে।

গনতান্ত্রিক পুনর্গঠনের যে বিষয়টিকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা আসলে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতাকে ঢাকার এক প্রচেষ্টা এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়।সরকারি কাঠামোর উচ্চস্তরীয় পদগুলো আজও Elite সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সাধারণ মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থ সেখানে উপেক্ষিত।

স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বিভিন্ন যুব সম্প্রদায়, নারীবাদী সংস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে চাইলেও Autonomy র অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য পায়নি।

১৯৭৫-৭৭ এর সময়কালে জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এনজিও র রাজনৈতিক ভূমিকার পথ প্রশস্থ হয়। ১৯৭৬ সালের "Foreign Contribution Regulation Act" NGO কার্যকলাপকে[4] বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এনজিও প্রবর্তিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প ও তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাধারন মানুষের অংশগ্রহণ সরকার এবং এনজিও সংস্থার যৌথ উদ্যোগের পথ সুগম করে। যদিও এই যৌথ প্রয়াস বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির প্রতি প্রথম দিকে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন।এনজিও কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখার জন্য Kudal Commission নিয়োগ করেন।প্রকৃতপক্ষে এইসময় সামাজিক পরিবর্তনে তিনি মনোযোগী হন। তাঁর ক্ষমতাকালে ও পরবর্তীতে রাজীব গান্ধীর শাসনকালে "Third Sector" হিসাবে এনজিও স্বীকৃতি লাভ করে।

তবে এইসময় এনজিওর চলার পথ খুব একটা মসৃণ ছিলনা। CPI(M) এর, বিশেষত, প্রকাশ কারাট এনজিও সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি মূলত এনজিও সংস্থাগুলির বিদেশী অনুদান লাভের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন এনজিও সংস্থার মাধ্যমে বিদেশি অর্থ লগ্নি প্রান্তিক জনসাধারণের স্বনির্ভরতার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।এমনকি তিনি FCRA কে জোরদার করার পক্ষে সওয়ালও করেছিলেন।তার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক কাজে যুক্ত কোন রকম এনজিও কে বিদেশি অর্থ সাহায্য লাভ থেকে বিরত রাখা।

যে হারে এনজিও কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো স্বাভাবিক ভাবেই তাতে তিনি শঙ্কিত হন এবং এনজিও কর্মকাণ্ডকে রাজনীতির থেকে দূরে রাখতেই তিনি তৎপর ছিলেন।এই প্রসঙ্গে তার অভিমত হোল, এনজিও কর্মকাণ্ড একদিক থেকে গণতান্ত্রিক অবক্ষয়কেই ডেকে আনবে।তবে এই বক্তব্য কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা অনুসন্ধানের দাবি রাখে।নতুন শতাব্দীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এনজিও কার্যকলাপ কিরকম, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়ায় সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন,তাদের স্বেচ্ছাসেবামূলক ভূমিকাই বা কতখানি,কততা রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে তারা কাজ করতে পারছে তা বিস্তারিত আলোচনার অন্তর্গত।

এন জিও এবং সরকারের যৌথ প্রয়াস

সাধারনভাবে বলা যায়,কাজের ক্ষেত্রে এনজিও কে সরকারের সাথে যুক্ত হতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, সরকারি ব্যবস্থার অধিনে নথিভুক্তিকরন এদের বেশ কয়েকটি সুবিধা প্রদান করে। এর মধ্যে উল্লেখ্য ট্যাক্স প্রদানে ছাড় প্রাপ্তি, কিংবা বিদেশি অনুদান লাভে সুবিধা প্রভৃতি। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় অনুদান লাভের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন Government grant in aid schemes এর অংশীদারিত্ব লাভেও এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া এন জিও কে সহায়তা করে থাকে।

উন্নয়নের সাথে যুক্ত এনজিও প্রতিষ্ঠান সমূহকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলো হোল Charitable Trust, Socities Section, 25 Companies প্রভৃতি। তবে যারই

অন্তর্ভুক্ত হোকনা কেন এন জিও সংস্থাকে অবশ্যই Societies Regulation Act (1860) এবং Income Tax Act (1976) এর অভ্যন্তরেই কাজ করতে হবে।অন্যদিকে বিদেশি অনুদান লাভের ক্ষেত্রে এনজিও গুলি Foreign Contribution Regulation Act এর অন্তর্গত যেটি Ministry Of External Affairs দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন NGO সরকারের আর্থসামাজিক বিভিন্ন প্রকল্পকে প্রভাবিত করে চলেছে।আরও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারত সরকার মূলধন নির্ভর অর্থনীতি থেকে দারিদ্য দূরীকরণে গুরুত্ব দিতে শুরু করলে এনজিও কার্যকলাপের দিকও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। পুরনো Service Delivery এর ভূমিকা থেকে সরে এসে গঠন মূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এনজিও সংস্থা গুলি। বিশেষত দারিদ্র দূরীকরণে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকে।

১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে রাষ্ট্র Macro Economy এর দিকে অগ্রসর হলে এর প্রভাব এনজিও দের কাজের ওপর এসেও পড়ে। তাদের কাজের অভিমুখ ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে।শুধু তাই ই নয় Policy Advocay তেও তারা নিজেদের যুক্ত করে।এরই হাত ধরে তারা Lobbying এও অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।সমাজের অনগ্রসর প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয় এনজিওদের উদ্যোগেই।এরই হাত ধরে সরকার ১৯৯০ এর দশকেই এনজিও সংস্থার সহিত বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প সম্পর্কিত আলোচনার পথ সুগম করতে কয়েকটি 'ফোরাম' গঠন করে। যেমন , ২০০০ সাল নাগাদ স্থাপিত Nodal Agency[4] রাষ্ট্র-NGO সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। এর কিছু সময় পর Council For Advancement Of People's Action And Rural Technology (CAPART) এর বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। যার ফলে অনগ্রসর এবং স্বল্প সুবিধা প্রাপ্ত জনসাধারণকে উন্নয়নে সামিল করা সহজতর হয়।অন্যদিকে NGO গুলির অর্থিক সাহায্য লাভের পথ প্রশস্ত করতে সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করে যেমন Central Social Welfare Board, National Wasteland Development Board প্রভৃতি।অন্যদিকে Voluntary Organisation ও সরকারের যৌথ উদ্যোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৭ সালে ভারত সরকারের মন্ত্রী পরিষদ Voluntary Sector এর পক্ষে 'National Policy' র অনুমোদন করে। এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল সরকারের তরফে Voluntary Organisation গুলির Registration প্রক্রিয়াকে সরলতর করে তোলা। এরই পাশাপাশি সংস্থাগুলির অভ্যন্তরে উদারীকরণ ও স্বাধীন কর্মক্ষেত্রের পরিধির বিস্তারও ছিল আর একটি প্রধান লক্ষ্য। কর প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এবং FCRA এর অধীনে বিদেশী অর্থ সাহায্য লাভের ক্ষেত্রে সরকার ও

[4] Society for Participatory Research in Asia(1991),*Voluntary Development Organisations in India:a Study of History,Roles and Future Challenges,New Delhi*

Voluntary Organisation গুলির মধ্যে সহযোগিতার অনুকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।এই উদ্যোগ উভয়েরই কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

তবে এনজিওর প্রতি রাষ্ট্রের পরিবর্তিত মনোভাব অনেকটাই সমস্যার উদ্রেক করেছে।ইতিবাচক দিক থেকে বলা যায়, শিক্ষা,স্বাস্থ্য,কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।সরকার স্থানীয় উন্নতি কল্পে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। এই প্রকল্প সমূহের বাস্তব রুপায়নের ক্ষেত্রে এন জিও সংস্থা গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে তাতে সমস্যার বিশেষ সমাধান হয়নি।কিছু ক্ষেত্রে এই যৌথ প্রয়াস সাফল্য অর্জনে সক্ষম হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে এবং বিকেন্দ্রীকরণ চালু হওয়ার সুবাদে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরন হয়েছে।ফলত সেই নীতি অনুসরন করেই কাজের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিভাজন বযায় রেখে স্থানীয় সরকারের ওপরও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।ফলত পূর্বে যে সব সরকারি প্রকল্পের সাথে এনজিও সংগঠন গুলি যুক্ত ছিল সেগুলি এখন স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের অংশ স্বরুপ। আসলে এই বিষয়টির সাথে রাজনৈতিক স্বার্থ বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

কিন্তু, এতে সাধারন মানুষের সুবিধার জায়গা কতখানি? পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথেই মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন আইন থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্তনশীল সরকারের বিভিন্ন পরিবর্তিত উদ্যোগ ও প্রকল্পের নেতিবাচক ফলাফলের শিকার হচ্ছে সাধারন মানুষেরা। এরই সাথে প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে যেসব অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ পথে নেমেছিল তারাও নানারকম সমস্যায় ভুগছে।এর মধ্যে আর্থিক সংকট অন্যতম, ফলে তাদের স্বাধীন কাজের পরিধি স্বাভাবিক কারনেই আরও সংকুচিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে একটি উক্তির অবতারনা করা যেতে পারে-' There are numerous examples of NGOs that have grown rapidly to essentially become large scale contractors of the government or have adopted a set of targets and management practices that erode the organisation's social core'

নীতির বাস্তবায়ন: সাধারনত দুরকম ভাবে সরকার তার নীতি বাস্তবায়িত করে থাকে। প্রথমত, প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন, দ্বিতীয়ত পরোক্ষ বাস্তবায়ন যার সাথে বাজার নিয়ন্ত্রণ বা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে।

প্রথম নীতির রুপায়নের ক্ষেত্রে সরকার, সরকারি নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ কাজ করে যাকে অন্যভাবে বলা যায় 'Command and Control'। মূলত কর ধার্য যাকে Regulatory Agency অর্থাৎ সরকার স্থির করে এবং এনজিও গুলি কর প্রদান করে সরকারকে। সুতরাং এখানে প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন ঘটে।

দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থনীতি সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রে সাধারনত বাজারকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।Subsidies, Taxes, বিভিন্ন Schemes ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী এই বিষয়ের অন্তর্গত।তবে এর পাশাপাশি সরকার প্রয়োজন মনে করলে নতুন কোনও নীতি প্রণয়ন করতে পারে বা কোনও কর্মসূচী গ্রহন করতে পারে যা বিকল্পের সূচনা করবে।

আমরা যদি এনজিও কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব এদের একটি অংশ সরকারি কার্যকলাপকে কোনও না কোনও ভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এরা কখনও বা সরকারি কর্ম প্রণালির সাথে যুক্ত থাকে কিংবা সরকারি অনুদান লাভ করে এবং একই সাথে সরকারী নীতিকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। তবে মূল প্রশ্নের জায়গা হল সরকারই যদি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম ধারক ও বাহক হয় তাহলে সরকারী নীতিকে এনজিওদের চ্যালেঞ্জ জানানোর পশ্চাতে কারন কি? এর উত্তরে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি যে বিভিন্ন কাজে নানা সময়ে সাক্ষরতার পরিচয় দিয়েছে একথা শাসক দলের কাছে অজানা নয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এমন বহু নীতির বাস্তব রূপায়নে সরকার অনেক সময় ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই কাজ গুলিই এনজিও সংস্থা সমূহ অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এমনকি কম খরচে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম এমন নজিরও রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য,কুটির শিল্প, নারীকল্যাণ সাধন থেকে শুরু করে শিশু সুরক্ষা ,শিশু শ্রমের বিলোপ, কিংবা পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন দায়িত্ব এন জিও দের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এরা যে যথেষ্ট সফলতার সাথে কাজ করতে সক্ষম তা আর নতুন ভাবে বলার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

সামাজিক কল্যাণ সাধনে এরা বিশেষ পারদর্শী একথা অনস্বীকার্য।তবে সরকারি Agenda র সাথে যুক্ত বলেই সরকার সম্পাদিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড বা যে কোনও সরকারী নীতিকে অন্ধ সমর্থন করার পক্ষপাতী অনেকেই নয়।এরকমই বেশ কয়েকটি এনজিও রয়েছে যারা সরকারী নিয়ন্ত্রণে কাজ করলেও সমান্তরালভাবে নির্দিষ্ট কোনও নীতিকে প্রভাবিত করে চলেছে।

সরকারী অর্থ সাহায্য নিলেও অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী নীতিকে সমালোচনার মাধ্যমে সেগুলির পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হয়েছে বেশ কিছু এনজিও। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে নানারকম প্রতিবাদ, প্রতিরোধ তার প্রমান। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক দলগুলির সাথেও বেশ কিছু এনজিও র সংঘাতের সম্পর্ক বর্তমান। সাধারন মানুষের জীবনের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জায়গা থেকে সরে এসে এনজিও গুলির কাজের লক্ষ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে একই সাথে। এ প্রসঙ্গে Ecological Concern এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

মূলত রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টা যেসব মানুষকে আলোর দিশা দেখাতে পারেনি তাদের প্রয়োজনকে রাজনৈতিক আঙিনায় নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সেসবের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই এন জিও দের একাংশ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করছে।

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ক্ষমতা লাভই হোল মুখ্য উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য পূরণে তারা জনসাধারণকে একমাত্র ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবেই ব্যবহার করে। নির্বাচনের পূর্বে ভোট লাভের আশায় সাধারন মানুষকে নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে এবং স্বাভাবিক ভাবে ভোটে জয়লাভের পর পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়। সরকারের এই ব্যর্থতাই তার প্রতি সাধারণ মানুষের অনাস্থার কারন।অন্যদিকে জনসাধারণের বক্তব্যকে সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও উপযুক্ত মাধ্যমের অভাব রয়েছে। আর এখানে এনজিও সংস্থাগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে জনগণের যোগসূত্র স্থাপনের ভূমিকায় অগ্রসর হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও প্রকৃত গণতন্ত্র কতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বিতর্কের বিষয়।

শিল্প সভ্যতার অগ্রগতি এবং তার বিস্তারে যেসব মানুষ ভুক্তভোগী, তাদের হয়ে আওয়াজ তুলেছে এনজিও কর্মীরা। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বলি হয়েছে লক্ষাধিক মানুষ। একদিকে তারা জমি,ঘর,বাড়ি হারিয়ে বাস্তুহারায় পরিনত হয়েছে অন্যদিকে জীবিকার অনিশ্চয়তায় ভুগছে। সরকারের কাছে পুনর্বাসনের আবেদন জানালেও অনেক সময়েই তার প্রকৃত সুরাহা পাওয়া যায়নি। আর এদের পক্ষেই সওয়াল করছে এনজিও প্রতিষ্ঠান গুলি। এদের নেতৃত্বেই এক নতুন ধারার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে।

অতীতের ভারতবর্ষে নানারকম আদিবাসী আন্দোলন বা কৃষক আন্দোলনের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় যদিও তার প্রকৃতি অনেকাংশেই পৃথক ছিল। এনজিও নেতৃত্বে বর্তমান সময়েও খানিকটা এইরকমের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, যাদেরকে নব্য সামাজিক

আন্দোলন বা New Social Movements নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাস্তুহারা এবং জীবিকা চ্যুত মানুষের একাংশ সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকবর্গ জীবন ও জীবিকাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়,ভারতের প্রথম মহিলা সংগঠন, Self Employed Womens [5]Association বা সংক্ষেপে SEWA ও Ganga Action Plan অথবা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন প্রভৃতি প্রমাণ করে যে মানুষ জীবনের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছে।শুধু তাইই নয়, শিশুদের শৈশবের অধিকার থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষাকে অন্যতম মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান, বার্ধক্যের নিরাপত্তার পাশাপাশি নারী সুরক্ষা ও শিশু শ্রমের বিলোপ সাধনেও ইতিবাচক ভূমিকায় এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন এন জিও প্রতিষ্ঠান।

সংস্থাগুলির ক্রমাগত চাপের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট Right of Children to Free and Compulsary Education Act পাশ করে।

এনজিওদের কাজের সাথে সরকারি ক্ষেত্রের সম্পর্ক আলোচনা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূল প্রশ্ন উঠে আসে। তাদের কাজের আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে এলাকাভিত্তিক দৃষ্টিকোন থেকে দুটি মূল ক্ষেত্রকে তারা কার্যভুক্ত করেছে।

একদিকে এরা তৃনমূল স্তরে আইন এবং নিয়মকানুনের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছে। অন্যদিকে, এনজিওরা চাইছে সরকারি পরিষেবা অত্যন্ত কম খরচে গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কারণ সরকার জনগনের প্রতি দায়বদ্ধ। সেক্ষত্রে জনগনের স্বার্থে উন্নয়ন প্রকল্পে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করলেও বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে অনেক পরিষেবাই সঠিকভাবে পৌঁছায় না অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্তরে উন্নয়নের উদ্যোগ নিলেও মূলত তৃণমূল স্তরের বহু মানুষই সেই উদ্যোগের বাইরে অবস্থান করে। এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এনজিওরা কাজ করছে। তারা মনে করে সরকার যেহেতু সাধারণ জনগনের প্রতি দায়িত্বশীল সুতরাং সাধারণ মানুষেরও সরকারি প্রকল্পও কর্মসূচী প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধানে তৃণমূল স্তরে তারা বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন ও সমিতি গড়ে তুলেছে। ম্যাক্রো লেভেল থেকে মাইক্রো লেভেল পর্যন্ত নিজেদের কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। জাতীয় বা স্থানীয় কোনও প্রকল্পকে সীমাবদ্ধ

[5] Singh,Anil K(1995),*Towards strategic networking:an experience,*New Delhi,Vani

করা চলবে না। বরং উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপন প্রয়োজন এই সত্যকে তা উপলব্ধি করতে পেরেছ।

তৃণমূল স্তরের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও অনগ্রসর অঞ্চল বিশেষত Zone ভিত্তিক কতগুলি গ্রাম এবং বস্তি এলাকাকে বেছে নেন। এদের মূল লক্ষ্য যেহেতু লাঞ্চিত নিপীড়িত কিংবা বঞ্চিত মানুষের হয়ে কাজ করা সুতরাং এই অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন যুক্তিসঙ্গত কারণ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের মাত্রা নগন্য সেটা জোর দিয়ে বলা যায়।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষদের কাছে শুধু সরকারি পরিষেবা পৌঁছানোকে সুনিশ্চিত করাই নয়, তাদের উপার্জনের পথ সুগম করাও এদের আর একটি অন্যতম লক্ষ্য। চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় যেমন এই কর্ম প্রক্রিয়ার অংশ তেমনি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষদের স্বনির্ভর করে জীবন নির্বাহকে সুনিশ্চিত করাও এনজিও লক্ষ্যের আর একটি দিক। এই স্বনির্ভরতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এবং দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন সমিতি গঠন করেছে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি। যেমন মহিলা ও শিশু কল্যান সমিতি, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পৃথক উদ্যোগ ও কর্মসূচী গ্রহন, তার বাস্তবায়ন, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুল স্থাপন, বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প প্রভৃতি। এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয়ের ওপর তারা জোর দেয়। যেমন— বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা, পানীয় জল, সেচব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং এই লক্ষ্যে ঋণ প্রদান, বনাঞ্চল, আদিবাসীদের উন্নয়ন,পরিবেশ দূষণ রোধ, মানব পাচার রোধ মূলত শিশু শ্রমিক বিলোপ নারী নিরাপত্তা, ত্রাণ পরিষেবা , ও প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুনিশ্চিতকরন।

তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাজের মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। প্রথমদিকে তৃণমূল স্তরের উন্নয়ন মূল লক্ষ্য হলেও পরবর্তী সময়ে মানুষের অধিকার প্রসঙ্গে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি সচেতন হয়ে ওঠে। সরকারের কাছ থেকে মানুষের কি কি অধিকার পাওয়া উচিত, সরকার কী কী আইন প্রণয়ন করছে, তার বাস্তবায়ন সঠিক ভাবে হচ্ছে কি না সংশ্লিষ্ট আইন কতখানি সাধারণ মানুষের স্বার্থের উপযোগী, আদৌ উপযোগী কিনা এবং যদি তা না হয় তবে তার পরিবর্তন সম্ভব কীভাবে এবং কতখানি এই বিষয়গুলি নতুন আলোচনায় জায়গা পায়।

তিনটি স্তরে মূলত এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করে, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তজার্তিক স্তরে[6]। গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারি আইন ও নিয়মনীতি প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ এবং এক্ষেত্রে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য হল নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরের মানুষদের অংশগ্রহণ কে সুনিশ্চিত করা। কারণ এটি তাদের আর এক অধিকারের প্রশ্ন। এই লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মতামতো গ্রহন করেন এবং পরবর্তীতে সেগুলিকে একত্রিত করে লিখিত ভাবে সরকারকে বিষয়টি জানান। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে জনগনের বিরোধিতার জায়গা কে পরোক্ষভাবে নীতি নির্ধারন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করার এবং প্রয়োজনানুসারে সংশ্লিষ্ট নীতিকে প্রভাবিত করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধযমে নীতিটিকে পরিবর্তন করার এই উদ্যোগ গ্রহন করে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোই।

সাধারন ভাবে বলা যায় সরকারি নিয়ন্ত্রনের বাইরে বেরিয়ে দেশ ও দশের এক কথায় সমাজের স্বার্থে সমবেত এক প্রয়াস হল এনজিও উদ্যোগের ভিত্তি। তবে সরকার এবং গণমাধ্যমের দৌলতে এই শব্দদ্বয় সমসাময়িক কালে পরিচিতি লাভ করলেও এদের বিবর্তনের প্রেক্ষিত, কাজের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ,কাজের প্রকৃতি ,প্রক্রিয়া প্রভৃতি নিয়ে অধিকাংশ মানুষই অবগত নন।

অন্যদিকে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় এনজিওর প্রতি একাংশের মানুষ বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। এনজিও সংস্থার কার্যকলাপ কিংবা কাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অনেক তাত্ত্বিক এবং গবেষক দেখিয়েছেন যে এই অংশের মানুষেরা মূলত এনজিওকে সন্দেহের চোখে দেখেন। যদিও সবার দৃষ্টিভঙ্গী সমান নয়। ফলত যে স্থানে এনজিও সংস্থা গুলি কর্মরত আছে বা যাদের জন্য কাজ করছে তারা এর মধ্যে দিয়ে কতোটা উপকৃত হচ্ছে সেটাই মুখ্য বিষয় এবং বিস্তারিত আলোচনার অন্তর্গত।

[6] Khan,Azeez Mehdi,(1997),*Shaping Policy:Do NGOs Matter?Lessons From India,*New Delhi:Participatory Research in Asia

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে এনজিও কার্যকলাপ ও সরকারের সাথে তাদের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গে এনজিওর কার্যকলাপ বর্ণনা করার পূর্বে অতীতের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনতিকাল পরেই মূলত 1960-এর দশকের শেষ এবং 1970-এর শুরুর দিক থেকে দরিদ্র ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনজিও সংস্থাগুলো উদ্যোগ নিতে থাকে। উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারের হলেও প্রকৃত অর্থে তা তৃণমূল স্তরের সাধারণ মানুষের অনুকুল না হওয়ার দরুণ স্বাভাবিক কারনেই বেসরকারিভাবেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এনজিও সংস্থাগুলি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনতিবিলম্ব পরেই সরকার সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ভাঙ্গতে শুরু করেছিল।জনসাধারণের উন্নতিকল্পে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করলেও তা বেশিরভাগ মানুষেরই উন্নয়ন ঘটাতে অক্ষম বলে প্রতিপন্ন হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণে বহু কর্মসূচী গৃহীত হলেও দরিদ্রের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।এছাড়া ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া অশান্তির প্রভাব ভারত ও তার অভ্যন্তরে পশ্চিমবঙ্গে এসেও পড়েছিল। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থীদের শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিশেষত জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ছাত্র, যুবক,শ্রমিক ও কৃষক, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সরকার কঠোর হস্তে এগুলো দমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং উন্নয়নের সান্ত্বনা স্বরূপ "গরিবি হটাও" প্রকল্প চালু করে যদিও তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি, যার অন্যতম উদাহরণ ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থার ঘোষণা।

তবে জরুরি অবস্থার অশান্ত পরিবেশ দমন কালে কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে।কিন্তু সরকার এদেরকেও সুনজরে দেখেনি এবং এক্ষেত্রে তারা বিদেশি অনুদান লাভের মাধ্যমে পরোক্ষে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করছে এমন গুজবও শোনা যেতে থাকে।এই লক্ষ্যেই সরকার ১৯৭৬[7] সালে বিদেশি অর্থ নিয়ন্ত্রন আইন লাঘু করেছিল যাতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির স্বাধীন কাজের পরিবেশ ব্যাহত হয় ।

[7] *Report of the Ministry of Rehabilitation* ,(1961),New Delhi,p.66

এছাড়া ৭০ এর শুরুর দিকে নাগরিক সমাজ সংগঠন গুলির সংখ্যাও বাড়তে থাকে।এদের মধ্যে এনজিও গুলি বিভিন্ন গবেষণা কাজের মাধ্যমে প্রমান করতে থাকে যে কেন দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ জনের জন্য সরকারি কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।অন্যদিকে তারা জনগনের সহভাগী পরিকল্পনা ও উন্নয়নের নতুন মডেলের পক্ষে বক্তব্য দৃঢ় করতে থাকে। যেমন শিক্ষা , কৃষি, বনায়ন, আদিবাসী ও দলিত উন্নয়ন, শিশু শ্রমের বিলোপ, মহিলা উন্নয়ন যা পরবর্তী সময়ে সরকারি নীতি কার্যক্রমে স্থান পেয়েছিলো।

এর পাশাপাশি 1960-এর দশকের শেষের দিকে ভারতীয় রাজনীতি আরও কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়। মূলত সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে এবং মাইগ্রেশন হলো যার অন্যতম প্রধান কারণ। 1947 সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত ও পাকিস্থান দুই পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হলেও যাবতীয় সমস্যা মেটেনি। পূর্ব পাকিস্থান থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং ভারতের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ বজায় ছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে 1970 পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে 6 মিলিয়ন জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে ত্রিপুরার মূল অধিবাসীদের তুলনামূলক সংখ্যা ছিল অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম ছিল না এবং পরবর্তী পর্যায়ে 1971 সালের যুদ্ধের আবহাওয়া এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে একটা সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির 32 শতাংশ মানুষই ছিল অনুপ্রবেশকারী।

এই পরিস্থিতিতে 1971 সালে ভারত পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সংকটময় মূহূর্তে পূর্ব পাকিস্থান থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটে যাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় ভারত সরকারকে। এই সময়ে পুনর্বাসন থেকে শুরু করে খাদ্য বিতরন, স্বাস্থ্য পরিষেবাসহ সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসে কয়েকটি হল Indian Red Society-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, অভয় আশ্রম, Bengal Rural Welfare Society প্রভৃতি। পুনর্বাসনের সমস্যার পাশাপশি কলেরাসহ অন্যন্য ব্যাধি মারাত্মক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে বেশ কয়েকটি স্থানে এমারজেন্সি মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উক্ত সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে Indian Medical Association এবং Oxfam এর সহায়তা গ্রহন করে। চারটি Medical Centre গঠনের

পাশাপাশি Red Cross দক্ষিণ ২৪ পরগনার হেলেঞ্চা অঞ্চলে অধিক সক্রিয় ছিল এবং এক লক্ষেরও অধিক রোগীকে তারা স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে সক্ষম হয়।[৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সংকটের প্রথম দিকে সংকট মোকাবিলায় কোনও প্রকার বিদেশী অর্থ সাহয্য পাওয়া যায়নি। ফলে নিজেদের উদ্যোগেই এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়েছিল। এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ সক্রিয় ভাবেই পরিষেবা প্রদানে এগিয়ে আসে যেগুলির মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণমিশন, Oxfam এবং অভয় আশ্রম অন্যতম। মূলত এসময়েই সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে তারা ত্রাণকার্যে নিজেদের নিয়োগ করে এবং সরকার প্রেরিত ত্রাণ পরিষেবা বিভিন্ন সংকটাপন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এদের মূখ্য ভূমিকা।

শরনার্থীদের অধিকাংশ মাসের পর মাস ক্যাম্পে থাকার দরুন খাদ্য দ্রব্যের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর সরঞ্জামও পৌঁছে দিতে হত সরকারকে।আর এই কাজে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে ছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। প্রায় 14 টি ক্যাম্প তৈরির পাশাপাশি সরকার প্রেরিত খাদ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিল এই সঙ্ঘ।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির অবস্থা ছিল আরও গুরুতর। একদিকে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি অন্যদিকে খাদ্যের অভাবও রোগের প্রকোপ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অবজ্ঞা খারাপতর করে তুলেছিল এই অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধারের কাজে ইতিবাচক ভূমিকা করে রামকৃষ্ণমিশন। সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সীমান্তবর্তী চারটি রাজ্যে 13টির মতো ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের আয়োজন করে মিশন। শুধু তাই নয়, উক্ত অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা পরিষেবা প্রদানে ব্রতী হয় তারা। এপ্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন যেকোনও আর্থিক অনুদান আন্তর্জাতিক স্তর থেকে কিংবা সরকারের তরফ থেকে মিশন পায়নি এবং সম্পূর্ন নিজেদের উদ্যোগেই মিশন বিপুল পরিমান অর্থ ত্রানকার্যে ব্যায় করে। দেড় লক্ষেরও অধিক শরনার্থীদের তারা ত্রাণ পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিবাচিক ভূমিকা পালন করে রামকৃষ্ণ মিশন।

উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রাম ও সল্টলেকে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করে প্রায় ৮০০০ এর অধিক শরনার্থীদের পরিষেবা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছিল Oxfam। এরই পাশাপাশি অভয়

[৪] Bandopadhyay,Sandip.(2000),*Millions Seeking Refugee:The Refugee Question in West Bengal:1971,*Calcutta:Mahanirban Research group,p.34

আশ্রম ও বেঙ্গল রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিসহ আরও কয়েকটি ত্রাণকার্যে লিপ্ত সংস্থাকে অর্থ সহায়তাও প্রদান করেছিল Oxfam। অর্থাৎ এই বিষয়টি স্পষ্ট যে এ ক্ষেত্রেও কোনও সরকারি আর্থিক অনুদান Oxfam পায়নি এবং সম্পূর্ন স্ব-উদ্যোগেই তারা ত্রানকল্পে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল।

শুধু মাত্র Oxfamই নয়, এসময় পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাটে ত্রানকার্যে নিযুক্ত ছিল Gandhi Peace Foundation। শরনার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি Indian Red Cross Society পোষাক, টীকা, ঔষধ বিতরণেরও দায়িত্ব নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চল্গুলিতে। শরনার্থীদের একটা অংশকে আর্থিক অনুদান দিয়েও সহায়তা করেছিল Red Cross। এমতাবস্থায় আরও কয়েকটি সংস্থা স্বেচ্ছাসেবার কাজে এগিয়ে আসে, যেমন Women's Coordinating Council, Lions Club প্রভৃতি।

পরিস্থিতি আরও গুরুতর হলে এবং রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পেলে শেষ পর্যন্ত UNICEF ত্রাণকার্যে অগ্রসর হয় এবং সরকার, অন্যান্য Voluntary Organisations এর সহায়তার মাধ্যমে 'Operation Lifeline' নামে একটি 'Nutrition' প্রকল্প গ্রহণ করে। ক্যাম্পের শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখতে এবং এবং ক্যাম্পে অবস্থানকারী শরনার্থীদের হস্তশিল্প তৈরির মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি।

এই অংশে আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে তা হল 1971 এর সংকটে বহু অনাথ এবং বিশেষত বহু সংখ্যক অল্পবয়স্কা মেয়েদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যাদের জন্য পৃথক বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি এগিয়ে আসে, পশ্চিমবঙ্গের কল্যানীতে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় যে প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর নাম অন্যতম। সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৮ টি হোম ও অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এনজিও সংস্থাগুলি। [9]শরনার্থী মহিলাদের এবিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তারা মূলত আয়া কিংবা নার্স হিসাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করেন।

জরুরী অবস্থার অবসানের পর ১৯৮০ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই দশকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলির মধ্যে উন্নয়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় ।কেবল মাত্র স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডই নয়, দীর্ঘমেয়াদী

[9] Chatterjee,Nilanjana.(1992),"*Midnight's Unwanted Children:East Bengali Refugees and the Politics of Rehabilitation",*Rhode island,Brown University

পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবতে শুরু করে এনজিও সংগঠন গুলি।সরকার গ্রামোন্নয়নের ধারণাকে এনজিও সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে Council for Advancement of People Action and Rural Technology তৈরি হয়।১৯৯০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত এনজিও ও সরকার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে যৌথ ভাবে কাজ করেছে যেমন কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু শ্রমের বিলোপ সাধন প্রভৃতি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল শহর রোজগার যোজনা, স্বচ্ছ পয়ঃব্যবস্থা, জল বিভাজিকা প্রকল্প, বনসৃজন, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম রোজগার যোজনা প্রভৃতি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনার মধ্যে দিয়ে এটা স্পষ্ট যে বেশ কিছু এনজিও স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে স্বেচ্ছাসেবার পাশাপাশি উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীতেও যথেষ্ট ইতিবাচক ভুমিকা পালন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে এনজিও কার্যকলাপ

গবেষণাপত্রে পশ্চিমবঙ্গে এনজিওর কার্যকলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে মূলত ২০০০ সালের পরবর্তী সময়কে নির্বাচিত করা হয়েছে।এইসময় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন ছিলেন বামফ্রন্ট সরকার।পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বামপন্থী আদর্শের সাথে এনজিওদের আদর্শের সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনই তাত্ত্বিক স্তরে বিরোধের জায়গাও যথেষ্ট রয়েছে । ৮ ও ৯ এর দশকের প্রথমদিকে চোখ ফেরালে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ।যেসময় বাম সরকার এনজিওদের খুবই সন্দেহের চোখে দেখত।সি পি আই (এম) নেতা প্রকাশ কারাতও তার বিভিন্ন বক্তব্যে এই বিষয়টিরই ইঙ্গিত দিয়েছেন।তার বক্তব্য অনুযায়ী , এনজিওদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের বাম আন্দোলনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া। সেক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পশ্চিমবঙ্গের এনজিও কার্যকলাপের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই বামপন্থী আদর্শের আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ স্থান অধিকার [10]করেছে। শুধুমাত্র তাই নয়, জনঘনত্বের দিক থেকে এই রাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে। অন্যান্য রাজ্য থেকেও অধিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যায় প্রবেশ করে। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে জনগনের অনুপ্রবেশ এখানে বর্তমান। ফলত, অধিক জনসংখ্যাজনিত সমস্যায় বহুদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তভোগী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সীমাহীন দারিদ্র।

[10] Agarwal,S.N.(1972*),India's Population Problem*,New Delhi,Asia Publications

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের আংশিক বাস্তবায়নের ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল একথা জোর দিয়ে বলা যায়। তা সত্ত্বেও সরকারী ব্যবস্থা অনেকাংশেই দারিদ্র দূরীকরণে সফল হয়নি একথাও একইভাবে সত্য। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার মধ্যে শহরঞ্চলের ৪৭ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের ৫৭ শতাংশ মানুষের অবস্থান ছিল দারিদ্রসীমার নিচে। এসময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত বন্যার কবলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছিল।

এই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে শক্তিশালী করা অর্থাৎ আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা । ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গই ছিল একমাত্র রাজ্য যেখানে নিয়মিতভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হত। একমাত্র এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই বামফ্রন্ট সরকার উচ্চস্তর থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিল এবং উক্ত ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্থানীয় স্তরের মানুষদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা।

এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের একাংশ যাতে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহনের সুযোগ পায়। এর ফলশ্রুতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক , রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অতীতে রাজনৈতিক অংশগ্রহনের অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই তাদের অধিকার প্রসঙ্গে বিশেষ অবগত ছিল না। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। দারিদ্রসীমার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষেরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার কিংবা নেতৃত্ব দানের সুযোগ লাভ করে যা ছিল অনগ্রসর, প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক।

গ্রামাঞ্চলেই কেবলমাত্র এই বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিলনা। শহরাঞ্চলের চিত্রও ছিল অনেকাংশে এইরকম। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এখানের শাসনব্যবস্থায় সাধারণ মানুষদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বামফ্রন্ট সরকার সুনিশ্চিত করেছিল। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকালেই পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটি গুলিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হত যে বিষয়টিকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম সাফল্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম ও শহর উভয় স্তরেই নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।এছাড়াও নগরায়নকে সুনিশ্চিত করা হয়, বহু

অর্গানাইজেশনও প্রতিষ্ঠিত হয় এই পর্যায়েই। সরকার বেকারত্ব সমস্যার সমাধানে 100 দিনের কাজের পরিকল্পনাও চালু করেছিল ।

গ্রামাঞ্চলের চিত্র ছিল আংশিক আলাদা। গ্রাম পঞ্চায়েত যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। সাধারণ মানুষের স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হওয়ার দরুন এবং গ্রামে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার এক অন্যতম অংশের মহিলারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় উপস্থিত থাকায় তাদের মতামতও বিশেষ মর্যাদা পায়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক তৃতীয়াংশ আসন ছিল মহিলা সংরক্ষিত। ফলে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়কে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা হয় যেগুলিকে মহিলা নেত্রীবৃন্দের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

এর আগে 1990 সালে কেন্দ্র সরকার শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে 'State Plan of Action for Children' গ্রহন করেছিল। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নতুন শতাব্দীতে শিশু উন্নয়নকে তাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে। অন্যদিকে আর যে দুটি বিষয়ে তারা গুরুত্ব দিয়েছিল সেগুলি হল সরকারী পরিষেবাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রান্তিক মানুষের মধ্যে পৌঁছানোকে সুনিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির ক্ষমতায়ন ঘটানো। বহুদিন যাবত মহিলারা তাদের বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, এবং সর্বোপরি শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন আদৌ এ পর্যন্ত কতটা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা মুশকিল। সুতরাং ২০০১ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে মহিলাদের অগ্রগতি এবং তারই পাশাপশি শিশুদের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এইসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল সরকারের। এখানেই যৌথ সহায়তায় অগ্রসর হয় UNICEF অর্থাৎ United Nations International Children's Emergency Fund.

১৯৯৯ থেকে ২০০২ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারের সহিত যৌথ উদ্যোগে UNICEF কাজ করতে সম্মত হয়। মূলত State Plan of Action for Children (SPAC) এর নীতির প্রণয়ন, সুবাস্তবায়ন কিংবা তদারকির কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ক্রমাগত অর্থ সহায়তা করার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত দিক থেকে সাহায্য করে চলেছে UNICEF।তথ্য অনুযায়ী ২০১৪-২০১৮ এর মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও পুরুলিয়া জেলা দুটিতে District Plan of Action for Children উদ্যোগের বাস্তবায়নেও UNICEF ইতিবাচক

ভূমিকা পালন করেছে।[11] অর্থাৎ SPAC কিংবা DPAC যাই হোক না কেন উভয়ক্ষেত্রেই সরকার ও UNICEF ক্রমাগত সহযোগীতার ভূমিকা পালনের মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে প্রয়াসী। এরকম অবস্থায় ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে প্রবল বর্ষনে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা বিশেষত মালদা, মুরশিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগণা এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি বন্যার কবলে আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে দার্জিলিং জেলায় মারাত্বক ভাবে ধস হওয়ায় সেখানকার পরিস্থিতি আরও খারাপতর হয়। কলকাতার পাশ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চলও জলমগ্ন হয়। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হন হাজারের অধিক সংখ্যক সাধারন মানুষ। কেবলমাত্র জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল তাই নয়, বহু পরিমাণ চাষযোগ্য জমি বন্যার কবলে জলমগ্ন হয়েছিল। ফলত কৃষিক্ষেত্র বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয় যার প্রভাব রাজ্যের অর্থনীতিতেও মারাত্মকভাবে পড়ে। রাজ্য সরকার উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হয়ে বুঝতে পারে যে কোনও প্রকার বিদেশী অর্থ সাহায্য ব্যতীত এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি লক্ষাধিক মানুষকে কেবলমাত্র যে ঘর ছাড়া করেছিল তাই নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার পথও বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলত তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার একও অন্যতম মাধ্যম ছিল সরকারী পণ্য ও পরিষেবা। এই পরিস্থিতিতে সরকারও লক্ষাধিক মানুষের দায়ভার বহন করতে গিয়ে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। যার মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট অন্যতম হলেও দুর্গত এলাকার সর্বত্র সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে সরকারী পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদান করাও ছিল সরকারের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাভাবিক ভাবেই বাধ্য হয়ে সরকার বিদেশী অর্থ সাহায্যের আবেদন জানায় এবং বিভিন্ন ননগভার্নমেন্টাল অরগ্যানাইজেশানকে সরকারের সাথে যৌথভাবে ত্রান প্রকল্পে কাজ করার আহ্বান জানায় ।মূলত বন্যার কবলে সাধারন মানুষের জীবনযাত্রা যেমন ব্যবহারিত হয়েছিল, পাশাপাশি বিভিন্ন মহলের মধ্যেকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছিল । বন্যা দূর্গত এলাকার টেলি পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বিছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তথ্য আদান প্রদানও সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পণ্য ও পরিষেবার ব্যবস্থা করা হলেও আক্রান্ত অঞ্চলে সুষ্ঠভাবে সেগুলিকে পৌঁছে দেওয়াও ছিল সমস্যা জনক। সুতরাং সঙ্কটের মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগের পাশিপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবামূলক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

[11] Deb,Arun.(2000),"The UCRC:Its Role in Establishing the Rights of Refugee Squatters in Calcutta",in *Refugees in West Bengal,Institutional Practices and Contested Identities,*Calcutta,Mahanirban Calcutta Research Group *:p.69*

সরকারি আবেদনে সাড়া দিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার ত্রাণ প্রকল্পে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে UNICEF সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিল। তবে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বিভিন্ন জাতীয় সংস্থাও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উদ্ধারকার্য ও ত্রাণ প্রকল্পে এগিয়ে আসে, যাদের মধ্যে অন্যতম হল OXFAM, CARE, CASA, CRS, Lutheran World Sercvice , MCC, West Bengal Voluntary Helth association প্রভৃতি। অন্যদিকে বিভিন্ন এনজিওয়ের সাথে পঞ্চায়েত স্তরের সহযোগীতাও তৈরি হয়, যাতে বন্য দূর্গত এলাকায় পারস্পরিক সমন্বয় স্থাপনের মাধ্যামে ত্রাণ প্রকল্পে দ্রুত ও সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভাবপর হয়। তবে 2000 সালের বন্যা পরিস্থিতিতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারের সহিত সর্বাধিক যৌথ উদ্যোগে কাজ করেছে UNICEF। মূলত যে সব ক্ষেত্রে UNICEF সহায়তা করেছিল, সেগুলো হল—

(i) প্রাথমিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য বোটের ব্যবস্থা করা।

(ii) পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্যের আশ্বাস প্রদান।

(iii) কেবলমাত্র অর্থ সাহায্যই নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দূর্গতদের সুরক্ষিত করা,

(iv) সুস্থঃস্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যহত রাখতে বন্যা কবলিত এলাকার জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, ব্লিচিং পাউডারসহ অন্যান্য দৈনন্দিন সরঞ্জামের সরবরাহ প্রভৃতি।

শুধু সরকারের স্বার্থেই নয় অন্যান্য নন-গভার্নমেন্টাল অরগ্যানাইজেশানের সাথে সহযোগীতার মাধ্যমে UNICEF মূলত বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের শিশু সুরক্ষা ও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার আদান প্রদানে বদ্ধপরিকর ছিল। শিশু এবং মহিলা দের প্রতি বিশেষ মনযোগ দেওয়া হয়েছিল। তবে সংকটের সম্পূর্ন মোকাবিলায় যে বিপুল পরিমান অর্থের প্রয়োজন ছিল তার সম্পূর্ন আয়োজন সম্ভব না হওয়ার দরুন সরকারকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সাথে লড়তে হয়। যদিও UNICEF সহ অন্যান্য সেচ্ছাসেবী সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকা বন্য পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিশেষ ফলে এনেদিয়েছিল এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগীতা ও সমন্বয় উল্লেখের দাবি রাখে।

কিন্তু এইসব সমন্বয়ের জায়গা বাদ দিলেও বিরোধীতার যে যথেষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে তা বেশ স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ১৯৯০ সালের শুরু থেকে United Nations Development Program মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট পেশ করে। শিল্পের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে উন্নয়নের হার আদৌ হচ্ছে কিনা , হলেও কতোখানি হচ্ছে কিংবা এর নেতিবাচক কি কি দিক রয়েছে তার খানিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে উক্ত রিপোর্টে। পৃথিবীতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অবশ্যই হয়েছে তবে তা মানুষের সার্বিক প্রগতির কতখানি

পরিপূরক তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক বর্তমান। বিশ্বের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পাশাপাশি যে কয়েকটি ধারনার উদ্ভব ঘটেছে তার চরিত্র খানিকটা অন্য রকম—

(i) কর্মহীন বিকাশ—> Jobless Growth

(ii) এমন বিকাশ যেখানে প্রান্তিক মানুষের অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরও খারাপ—> Ruthless[12] Growth

(iii) অধিকারহীন বিকাশ—> Voiceless Growth, এখানে জনসাধারণের বক্তব্য উপেক্ষিত।

(iv) শিকড়হীন বিকাশ—> Rootless Growth

(v) ভবিষ্যতহীন বিকাশ—> Futureless growth

প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করতে কিংবা পরবর্তী প্রজন্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে সেই সম্ভাবনাকে দৃঢ়তর করতে উন্নয়নের তথাকথিত ধারণা কতখানি তৎপর সেই বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে 1990 সালের পরবর্তী পর্যায় থেকে শুরু করে নতুন শতাব্দীতে এসে সাধারণ মানুষের জীবন এবং তদুপরি নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে এনজিও সংগঠন।

তবে আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা কিংবা নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে UNICEF ,বিশ্বব্যাংক কিংবা অন্য কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন না থেকে স্বাধীন ভাবে জন্ম নেওয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এনজিও সংগঠন স্থানীয় কিংবা জাতীয় স্তরে কিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করছে, কোন কোন ক্ষেত্রের ওপর তারা অতিরিক্ত মনোযোগ দিচ্ছে, কর্মসূচীর বাস্তবায়নে সরকারের সাথে যোগসূত্র রয়েছে কিনা,থাকলেও তার প্রকৃতি কি,এনজিও কার্যকলাপে সাধারণ মানুষ কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে ক্রিয়াশীল কয়েকটি এনজিও সংগঠনকে বেছে নেওয়া হয়েছে।উক্ত এনজিওদের বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং কাজের ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতার জায়গাটিকেও পরবর্তী আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এনজিও কার্যকলাপ ও সরকারি ক্ষেত্রের সাথে এনজিওদের সম্পর্ক আলোচনা করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা যে অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করব সেটির নাম হলো স্বয়ম বা Swayam যার মূল লক্ষ্য হলো বৈষম্যহীন এক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা। উক্ত

[12] সিনহা,ডঃসুজিত,(২০০৫),"বিকল্পের সন্ধান ও এনজিও", *উন্নয়নের খোঁজে এনজিও,* কলকাতা,ডেভ্লপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার

সমাজে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আশ্বাস যেমন থাকবে, তেমনি যাবতীয় হিংসাত্মক আচরণেরও অবসান ঘটবে। মূলত মহিলাদের বিষয় নিয়েই স্বয়ম তার কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে। নারীর প্রতি যেকোন প্রকার অনাচার অবিচার হিংসাত্মক আচরণ এর অবসান ঘটাতে এরা বদ্ধপরিকর। হিংসাত্মক আচরণ এর অবসান এর মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই এদের অন্যতম লক্ষ্য। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর ক্ষমতায়নে স্বয়ম আগ্রহী এবং উক্ত ব্যবস্থার বাস্তবায়নে বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা স্বয়মের মূল কাজ।

স্বয়ম এর প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৫ সালে স্বয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়।সে সময় থেকেই শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে এটি নিরন্তর কাজ করে চলেছে।পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে কর্মস্থলের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে উৎসাহী।

কর্মক্ষেত্রের পরিধিঃ স্বয়ম থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক রিপোর্ট এর তথ্য অনুযায়ী গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই স্বয়ম কর্মরত।পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দুটি ব্লকের ৩২ টি গ্রাম কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দুটি 'বরো' হলো এদের মূল কর্মক্ষেত্র।সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মহিলারা মূলত এর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।তবে এগুলোর পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি,বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন সময়ে স্বয়ম থেকে নানান পরিষেবা লাভ করেছেন।কলকাতার তিনটি জায়গায় এদের কার্য সম্পাদিত হয়। এগুলি হল হাজরা, মেটিয়াবুরুজ এবং ডায়মন্ডহারবারের সরিষা।

কাজের প্রকৃতিঃ মূলত দুই রকম ভাবেই স্বয়ম কাজ করে। একটি হল Preventive[13] এবং অন্যটি হলো Curative।একদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তা সে গৃহের অভ্যন্তরেই সংগঠিত কোন নির্যাতন হোক কিংবা গৃহের বাইরে সমাজের অন্যত্রই হোক তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। আরো বিস্তারিত ভাবে বলা যায়,গৃহের অভ্যন্তরে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে শুরু করে সমাজের যে কোন প্রান্তের যেকোন প্রকার নির্যাতনের প্রতিরোধ করে স্বয়ম।

[13] Interview by researcher,02/01/2019

পরিষেবাঃ দু'ধরনের পরিষেবা স্বয়ম প্রদান করে। প্রথমতো নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রত্যক্ষ পরিষেবা প্রদান করে। যেসব মহিলা গৃহের অভ্যন্তরে কিংবা সমাজের অন্যত্র নানা রকম হিংসামূলক কার্যকলাপের শিকার হয় তাদের এইসব সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা করে।পুরুষশাসিত সমাজে পরিবারের অভ্যন্তরে মহিলারা নানা রকম নির্যাতনের শিকার হয। নির্যাতনের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ বর্তমান।কখনো পণপ্রথার কবলে পড়ে নানাভাবে অত্যাচারিত হতে হয় কিংবা অনেক সময় অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর না হওয়ার দরুন স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ তারা পায় না।এর ভয়াবহ প্রভাব এসে পড়ে তার ব্যক্তিগত জীবনে। দীর্ঘদিন যাবত এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির ফলে একদিকে মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয় অন্যদিকে শারীরিক ভাবেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।উপযুক্ত সমর্থন না থাকার দরুন কিংবা সাহস না জুগিয়ে উঠতে পারার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিনের পর দিন মহিলারা এই নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হন যার কুফল অনেক সময় মানসিক ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।স্বয়ম এই নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে চায় তাদের মানসিক শারীরিক অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নেয়।তাদের নিজেদের অধীনে নিয়ে এসে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস নেয় স্বয়ম। তবে কেবলমাত্র প্রাথমিক চাহিদা পূরণই নয়, আক্রান্ত মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগও স্বয়ম গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল -বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া ও কর্মসূচীর মাধ্যমে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে উদ্যোগী।আমরা যদি ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব নারী পুরুষ বৈষম্য সেখানে প্রকট। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নারী পুরুষ বৈষম্য থাকলেও এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশ গুলিতে তা সর্বাধিক।এর মধ্যে ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের গাঁটছড়া চিরদিন নারীর উপর সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন,আত্মীয় পরিজন এর পরিচর্যা ও গৃহস্থালির যাবতীয় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে এগুলো নারীর জীবনের অন্যতম কর্তব্য।অর্থাৎ সামাজিক অনুশাসন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তেই নারী-পুরুষের অধীন।স্বাধীনতা পাওয়ার অবকাশ নারীর নেই। নারীর স্বাতন্ত্র্য সেভাবে কখনোই স্বীকৃত হয়নি।আজকের চিত্রেও সেই পুরনো ধারাই অব্যাহত আছে। ফলে নারীর নিজস্ব পরিচয়ের জায়গা অবশিষ্ট নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন দেশের নারীরা এই লিঙ্গ বৈষম্য মূলক অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন।বিভিন্নভাবে এই লিঙ্গ বৈষম্যের কারনকে বিশ্লেষণ করে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।কারন গুলির মধ্যে অন্যতম হলো পরিবারের অভ্যন্তরে শ্রমবিভাজন,শাস্ত্রের বিভিন্ন

বিধান কিংবা নানাবিধ রাষ্ট্রীয় আইন।শ্রমবিভাজন কিংবা শাস্ত্রীয় বিধান এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু সময় নারী জীবনের মানবাধিকারের জায়গার সংকুলান ঘটেছে। নারীর স্বাতন্ত্র ব্যাহত হচ্ছে, তার আত্ম-উপলব্ধির সুযোগ সেখান অনুপস্থিত।ফলত নিজেদের অধিকারের দাবি নিয়ে নারী কখনো সেভাবে সরব হয়নি। দীর্ঘকাল যাবত এভাবেই জীবন নির্বাহ করে চলেছে । নারী নির্যাতনের ওপর কিংবা বৈষম্যমূলক সমাজের অনুশাসন ভেঙে রাষ্ট্রীয় আইনও নারী শোষণের অবসানে বহু ক্ষেত্রেই সদর্থক কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময় সোচ্চার হয়েছে এনজিও সংস্থাগুলি যার মধ্যে স্বয়ম অন্যতম।স্বয়ম চাইছে সরকার, সামাজিক অনুশাসন এবং সর্বোপরি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলতে যেখানে যাবতীয় শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতনের অবসান ঘটবে, নারীর সুস্থ স্বাভাবিক ও স্বাধীন জীবনযাত্রার দ্বার উন্মুক্ত হবে।

এবার দেখা যাক স্বয়ম প্রত্যক্ষ পরিষেবা[14] কিভাবে পৌঁছে দেয়।প্রত্যক্ষ পরিষেবার মধ্যে দিয়ে এই সংস্থাটি আক্রান্ত মহিলাদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাদের আত্মবিশ্বাসী এবং স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।তবে কেবলমাত্র আক্রান্তই নয়, তার পরিবার কিংবা সন্তান-সন্ততিকেও বিভিন্ন প্রত্যক্ষ পরিষেবা প্রদান করে।কারণ এই সংস্থা মনে করে যে সমস্যার যদি সম্পূর্ণ সমাধান করতে হয় তবে একমাত্র মূল থেকেই তাকে বিনাশ করতে হবে।এ কারণেই ব্যক্তির পাশাপাশি পরিবার, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ স্বয়ম আধিকারিক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী [15]স্বয়ম প্রতিবছর শহর ও গ্রামাঞ্চলের গড়ে ১২৬৮ জন মহিলা, তাদের পরিবার এবং সন্তানদের সাথে যৌথভাবে কাজ করে।তিনটি মূল কেন্দ্র থেকে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় সেগুলি যথাক্রমে কলকাতার অভ্যন্তরে অবস্থিত হাজরা ও মেটিয়াবুরুজ অঞ্চল ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবারের অভ্যন্তরে অবস্থিত সরিষা। তবে তিনটি মূল কেন্দ্র কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হলেও অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলা উল্লেখ্য উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার আক্রান্ত মহিলারাও এই অ- সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা লাভ করে থাকেন।

পরিষেবা প্রদান- স্বয়মের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গড়ে এক হাজারেরও বেশি মহিলাকে এই এনজিও সংস্থাটি প্রত্যক্ষ পরিষেবা প্রদান করে থাকে।স্বয়ম আধিকারিক জানান, ২০১৪-১৫ চলতি বছরে এবং ২০১৬-১৭'র মধ্যবর্তী সময়ে এদের সংখ্যা ২৮

[14] Interview by researcher ,02/01/2019
[15] Interview by researcher,02/01/2019

শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।অন্যদিকে আইনি জটিলতা দূর করতে স্বয়ম বিভিন্ন আইনি পরিষেবা প্রদান করে।

তবে অনেক সময় আইনি পরিষেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যা হ্রাসও পেয়েছে।কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সহায়তা লাভ করার পর আক্রান্ত মহিলারা নিজেরাই নিজেদের মামলা সংক্রান্ত সমস্যা স্বাধীনভাবে সমাধানে উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন।সে ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে কারণ এক্ষেত্রে তারা আর স্বয়মের সমর্থন নির্ভর হয়ে কাজ করছেন না।

সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বয়ম দুধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। প্রথমতো ব্যক্তিগত স্তরে পরিষেবা প্রদান দ্বিতীয়ত দলবদ্ধভাবে সংগঠিত কিছু কর্মসূচীর বাস্তবায়ন।ব্যক্তিগত স্তরে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ইস্যু অনুযায়ী আক্রান্ত মহিলার ব্যক্তিগত জীবনের পরিস্থিতি কিংবা তার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুখোমুখিভাবে আলোচনার আয়োজন কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে আক্রান্তের মানসিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া,পরিস্থিতির প্রয়োজনে আইনি পরামর্শ দেওয়াএবং সেই সঙ্গে আইনি সহায়তা প্রদান প্রভৃতি।আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যোগ্য উকিল নিয়োগে সহায়তা করা কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুলিশের সহায়তা লাভে সহযোগিতা করা।এছাড়া এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মশিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে, প্রয়োজন হলে আক্রান্তের নিরাপদ আশ্রয় এবং আয়ের পথ সুগম করার উদ্যোগ নেয়।

যৌথ প্রয়াসঃ আক্রান্ত মহিলাদের নিয়ে এই সংস্থা দলবদ্ধভাবে কাজ করারও উদ্যোগ [16]নেয়।অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মহিলারা দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতনের শিকার হওয়ার দরুন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন কেবলমাত্র তাই নয় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসেরও অভাব দেখা যায়।একটানা এই সমস্যা চলতে থাকার দরুন এক প্রকার মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়।সাহস কিংবা উপযুক্ত সমর্থন না থাকার দরুণ অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ প্রকাশ এর জায়গাও সংকুচিত হয়ে যায়। এদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।মূলত এদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মানুষদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে স্বয়ম।যেসব মহিলারা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এক রকম সামাজিক নেটওয়ার্ক গঠন করে । পারস্পরিক মতামত বিনিময় এবং আলাপ

[16] Interview by researcher,02/01/2019

আলোচনার পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে এক প্রকার মঞ্চ তৈরি করা হয় যার মাধ্যমে আক্রান্ত মহিলারা নির্দ্বিধায় নিজেদের পারিবারিক সমস্যার কথা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন।সমস্যার কথা প্রকাশের মাধ্যমে এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যা সমাধানেরও সূত্র খুঁজে পাওয়াও সহজ হয়।

স্বয়মের দলীয় কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেন্টাল হেলথ ক্যাম্প, বিভিন্ন সহায়ক দল গঠন স্ব-ক্ষমতায়ন,পারস্পরিক আলোচনা ও মতামত বিনিময়, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ যেখানে মূলত মানুষের ক্রোধ হ্রাসের ওপর জোর দেওয়া হয়, পিকনিকের আয়োজন,প্রতিষ্ঠা দিবস পালন এবং সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।এই দলের কর্মসূচীগুলির মধ্যে একদিকে যেমন আক্রান্ত মানুষের পারস্পরিক আদান-প্রদানের পথ সুগম করা হচ্ছে অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিভিন্ন মতামত এবং অভিজ্ঞতার কথাও তারা অন্যদের সাথে ভাগ করতে সমর্থ হচ্ছে ফলত এদের নিজেদের ঐক্যবদ্ধকরনের একটা প্রচেষ্টা এখানে লক্ষ্য করা যায়।এক ধরনের সুস্থ পরিবেশ এর অধীনে নিয়ে এসে স্বয়ম আক্রান্ত মানুষগুলোর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাসী এবং আত্ম নির্ভর করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার দেয়।

শিশুদের সাথে কাজের প্রক্রিয়াঃ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সমস্ত পরিবারের মধ্যে এই সব অত্যাচার বা নিপীড়ন মূলক ঘটনা ঘটতে থাকে সেখানে বসবাসকারী শিশুরাও উক্ত পরিবেশের শিকার হয়। প্রত্যক্ষভাবে তাদের ওপর কোনোরূপ নির্যাতন না হলেও পরিবারের মধ্যে সংঘটিত নির্যাতন কিংবা নিপীড়নমূলক আচরণের প্রভাব পরোক্ষভাবে শিশুর ওপর এসে পড়ে।প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার দরুন তাদের মনে এক ধরনের অবসাদ কাজ করতে থাকে। কেবলমাত্র মানসিক অবসাদই নয়, নানা রকম শারীরিক সমস্যায়ও তারা ভুগতে থাকে।এ কারণে আক্রান্ত মহিলার পাশাপাশি তার সন্তানদেরও পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে স্বয়ম।মহিলাদের ক্ষেত্রে যেভাবে পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় অনুরূপভাবে শিশুর ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিবছর ১৫০ এর অধিক ৪ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক শিশুরা স্বয়মের সহায়তা লাভ করে থাকে।এই সাহায্যার্থে গৃহীত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় গুলো হল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাহায্য করা, শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রশিক্ষণের আয়োজন, বিভিন্ন ভাবে Psychotherapy[17] ও Play Therapy'র ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। দলীয় স্তরে আক্রান্ত বাচ্চাদের একত্রিত করে বিভিন্ন ওয়ার্কশপের

[17] Interview by researcher,02/01/2019

আয়োজন, পিতা-মাতা ও সন্তান সম্পর্কের আসল জায়গা সম্পর্কে তাদের অবহিত করে তোলা, পরিবারের অভ্যন্তরে বাচ্চারা কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার সম্যক ধারণা লাভ, লিঙ্গ বিভাজন প্রসঙ্গে তাদের জানানো, Summer Camp এর আয়োজন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা ইত্যাদি।

তবে কেবলমাত্র আক্রান্ত মহিলা কিংবা তার সন্তানের স্বাভাবিক জীবন ফেরানোর প্রয়াসই নয় সংশ্লিষ্ট পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও তাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে এই সংস্থা মনে করে। নির্যাতিতা মহিলার পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে স্বয়ম আধিকারিকদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে দেখা হয়। অনেক সময় দেখা যায় পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক চাপের বশবর্তী হয়েই মহিলারা তাদের সমস্যার বিষয়টি প্রকাশ্যে আনতে চান না। বিষয়টি প্রকাশ পেলে তার প্রতি অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে কিংবা সামাজিক অনুশাসন এর এক প্রকার ভীতি তাদের মধ্যে কাজ করে।

এছাড়া একই সাথে পরিবারের তরফ থেকেও উপযুক্ত সমর্থন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না এবং মহিলারা কিছুটা নেতিবাচক মনোভাব অনুসরণ করেই চলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই এনজিও সংস্থাটি মনে করে আক্রান্ত মহিলার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য এবং অন্য ক্ষেত্রে কিছু পরিবারকে একত্রিত করে যৌথ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সামাজিক উদ্যোগ ও পরিবর্তনের প্রয়াসঃ স্বয়ম বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচী র বাস্তবায়ন এর [18]মধ্যে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে, যে সমাজে যাবতীয় লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটবে,নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে,নারীর ভূমিকা কেবলমাত্র সন্তান প্রজনন কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পরিচর্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা, তার নিজস্ব পরিচিতি থাকবে,স্বাধীন সত্তা যেমন থাকবে তেমনই স্বাধীন মত প্রকাশেরও অধিকার থাকবে, নারী হবে আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভর আর যাবতীয় শোষণ ও অত্যাচারের অবসান ঘটবে,নারীর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের পথ প্রশস্ত হবে।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই স্বয়ম বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী প্রণয়ন করে,জনসচেতনতা তৈরী করে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে,সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে আক্রান্ত মানুষগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য

[18] Interview by researcher,02/01/2019

জনসাধারণকেও তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও মতামতের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে সমবেত স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। যে কোনো কর্মসূচীর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে কাজের অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর। এই এনজিও সংস্থাটি এই বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন প্রচারমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যে দিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষদের একত্রিত করে তারা এক রকম নেটওয়ার্ক তৈরি করে। এই নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অগ্রসর হয। স্বয়ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, প্রতি তিন বছর অন্তর প্রায় তিনশোর কাছাকাছি Campaign ও Awareness Programme গৃহীত হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত এই সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে প্রায় 6.5 লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে স্বয়ম সক্ষম হয়েছে।

সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন- স্বয়ম লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনে উদ্যোগী।সমাজে বসবাসকারী মহিলাদের একটা বড় অংশ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল নন। পরিবার এবং সমাজের সর্বত্র পুরুষের একাধিপত্য। সাধারণ নিয়ম অনুসারে পুরুষের প্রতি নারীর আনুগত্যই কাম্য বলে প্রচলিত।পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই পুরুষ ক্ষমতাবান আর নারীকে আত্ম-বলিদান দিতে হয় পুরুষের সেবায়।সমাজের সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্য প্রকট এবং নারীরা পুরুষের থেকে পিছিয়ে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাম্য, স্বাধীনতা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের অঙ্গীকার পরিচ্ছেদের 14 15 ও 16 নং ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নারী-পুরুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে পঞ্চাশের দশক থেকে কতগুলো রাষ্ট্রীয় আইন প্রণীত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীর অধিকার বিষয় প্রসঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই তারা সচেতন নয়। সুতরাং তাদের একত্রিত করে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারও যে অন্যতম মানবাধিকারের অংশ এই বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করার দায়িত্ব স্বয়ম গ্রহণ করেছে। শুধু মানবাধিকারের প্রশ্নই নয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করার প্রধান হাতিয়ার বলে এদের একাংশ মনে করেন। এই লক্ষ্য পূরণের তাগিদে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর স্বয়ম গুরুত্ব দেয়। এরই পাশাপাশি পণ প্রথার বিলোপ সাধন, নারী হিংসা, ঘরে বাইরে নারী নিপীড়ন, নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো প্রতিনিয়ত সংঘটিত ঘটনার

মোকাবেলার কৌশল নারীরা যাতে রপ্ত করতে পারে সেই বিষয়টি তদারকি করে এই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। নারীর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ও পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে না থেকে স্বাধীন উপার্জনের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী শিক্ষার প্রসারেও উদ্যোগ নেওয়া হয়। সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী, নারীদের যদি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা যায় তবেই নারী নিজের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে সক্ষম হবে।তবে কেবলমাত্র অংশগ্রহণেই এরা থেমে থাকেনি।স্বয়ম উপলব্ধি করেছে, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নারী-পুরুষ নিরপেক্ষ সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পুরুষদেরও নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই ছেলে এবং পুরুষদেরও নিজেদের বিভিন্ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছে।আমরা যদি সামাজিক বিভাজন নিয়ে কথা বলি তবে এক দিক থেকে সেই বিভাজন দূর করা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই যৌথ প্রয়াস কাম্য।

নারীর ক্ষমতায়নঃ সাধারণভাবে ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় এমন স্থানে অবস্থান করা যেখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সহজেই যুক্ত থাকা যায়।পারিবারিক, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত । নারীর পারিবারিক ও আর্থসামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন সমাজের অন্যত্র এসে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীর স্বশাসনের বিষয়টি তাঁর সামাজিক অবস্থানের নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে। ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে স্বয়ম নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি নারী নেতৃত্ব বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে । সংশ্লিষ্ট এলাকার চারটি পঞ্চায়েত সহ নারী সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। এই Action Group এর অন্যতম কাজ হলো নারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত [19] যেকোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা। কেবলমাত্র তাই নয় নির্যাতনের শিকার হওয়া মহিলাদের সহায়তা প্রদান থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক ধরনের চাপ সৃষ্টিকারী দল হিসাবে ওরা কাজ করে।পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে কিংবা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে আলাপ আলোচনার আয়োজন করে। এই যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে এরা স্বতন্ত্র, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে এদের যোগাযোগ নেই। নারী সুরক্ষা কমিটির যাবতীয় কার্যকরী চালনা মূলত কমিটির নিজস্ব নিয়ম-কানুন এবং রীতিনীতি মেনে হয়ে থাকে। অন্যদিকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে কিংবা বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে কলকাতার মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে স্বয়ম গঠন করেছে 'Insaaf Ki

[19] Interview by researcher ,02/01/2019

Awaaz' [20](IKA)।এই দুটি গ্রুপকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত, নারী বৈষম্য ও নারী নির্যাতন সম্পর্কিত, নারীর ক্ষমতায়ন,সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে সচেতনতার প্রসার,আক্রান্ত নারীদের উদ্ধার প্রক্রিয়া , আইনি সহায়তা প্রদান ও অন্যান্য সাহায্য।

এ তো গেল সাংগঠনিক আলোচনা। এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক Insaaf Ki Awaaz ও Nari Suraksha committee দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

প্রথমত, NSC ও IKA যেসব অঞ্চলে কর্মরত সেখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে, জন্ম নিবন্ধিকরন,নাগরিক পরিচয় পত্র তৈরি প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ তথ্যাবলী সরবরাহ করে থাকে। এরই পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন সরকারি ভাতা প্রসঙ্গে তথ্য প্রেরণ করে থাকে স্বয়মের এই দুটি ইউনিট।

দ্বিতীয়তঃ পরিবারের অভ্যন্তরে নারী নির্যাতনের শিকার হওয়া 21 টি কেসে তারা হস্তক্ষেপ করেছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের থেকে শুরু করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নির্যাতন রোধে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে অগ্রসর হয়েছে।

তৃতীয়তঃ স্বয়ম যেসব এলাকায় কর্মরত সেখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী গ্রহণ করে। NSC, IKA এর অন্যতম কাজ হল, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা পালন করা। 2017 সালের ৪ ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে[21]ডায়মন্ড হারবারের সরিষা অঞ্চলে Acid Attack বন্ধ করার প্রয়াসে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বয়ম এরকমই একটি Public Awareness Program এর আয়োজন করেছিল।

চতুর্থতঃভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম একটি সমস্যা হল বর পণপ্রথা।বিশেষত বর পণ প্রথার ফলে অসংখ্য বধূ নির্যাতন ও বধূ হত্যার ঘটনা সমাজের এক নিত্য চিত্র।ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী এখন ভারতে বরপণ জনিত কারণে দেড় ঘণ্টায় একজন করে নারীর মৃত্যু হয়। ২০০০ সালে পণ জনিত কারণে বধু

[20] Interview by researcher,02/01/2019

[21] Swayam,(2017),*Empowering Women and Communities,a report*

মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬৯৯৫ আর ২০১০ সালে যা দাঁড়িয়েছে ৮৩৯১।এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত বলে স্বয়ম মনে করে।আসলে সভ্যতার অগ্রগতি হলেও মানুষের চেতনার কতটা প্রসার ঘটেছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মেয়েরা আজও পরিবারের দায় এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে বরপণ দিয়ে বরকে কিনে আনতে হয়।স্বয়ম এই সামাজিক কুপ্রথা দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের পণ প্রথার কুফল প্রসঙ্গে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে।
তবে স্বয়মের অধীনে কাজ করলেও সমসাময়িককালে 'ইনসাফ কি আওয়াজ' অনেক সমস্যার মোকাবেলা স্বাধীনভাবে করার উদ্যোগ নিচ্ছে ।

Advocacy:

ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধের মাধ্যমে নারীর অধিকার সুরক্ষিত করতে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন আইনের যথাযথ প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করতে স্বয়ম স্থানীয়, জাতীয় এবং একইসাথে আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে অংশ নেয়।

খ)রাজ্যস্তরে সহযোগিতা -রাজ্য সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে স্বয়ম বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন [22]করে। West Bengal AMAN-Global Voices for Peace in the Home এর সাথে স্বয়মের সংযোগ বর্তমান। 'Protection of Women from Domestic Violence Act' (2005) এর প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন সময়ে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সাথে যৌথভাবে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। কেবলমাত্র তাই নয় PWDVA (2005) এর সুবিধা যাতে সব প্রান্তের নির্যাতিতরা পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন মহিলা সহায়িকা লাইন যেমন CHILDLINE সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন করেছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় স্তরে COMPLAINT COMMITTEE গঠনের জন্য সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছে। রাজ্য মহিলা কমিশন PWDVA (2005) এর বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা এবং যদি না হয়ে থাকে তবে কিভাবে উক্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে এক রিপোর্ট কেন্দ্র সরকারের কাছে পেশ করে। এই লক্ষ্যে তারা একটি কমিটি গঠন করেছিল যার মধ্যে স্বয়ম ছিল অন্যতম সদস্য। বলাই বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক, AMAN Network এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সাথে স্বয়মের বেশ সহযোগিতার সম্পর্ক বর্তমান।

[22] Interview by researcher,02/01/2019

আন্তর্জাতিক যৌথ প্রয়াসঃ রাজ্যস্তরে এবং জাতীয় স্তরের পাশাপাশি স্বয়ম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথেও সহযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। 2015 সালের মার্চ মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত Beijing Platform for Action এর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে Commission on the status of [23]Women এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।স্বয়ম সক্রিয়ভাবে উক্ত বৈঠকে যোগদান করে।একই সময়ে United Nations Women ও UNFPA এর প্রধানের সম্মুখে স্বয়ম নারী নির্যাতন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ও পেশ করে। UN এর পাশাপাশি 2015 সালে স্পেনের মাদ্রিদে UN কর্তৃক আয়োজিত বৈঠকে নির্যাতনের শিকার হওয়া মহিলাদের সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদান থেকে শুরু করে কিভাবে সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় সে প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

২০১৪ সালে জেনেভা শহরে Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) এর মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যার অংশ ছিল স্বয়ম।CEDAW এর অন্যতম কাজ হলো সরকার কর্তৃক প্রেরিত বার্ষিক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন।ভারতের বিভিন্ন মহিলা সংগঠন বিভিন্ন সময়ে নারী সুরক্ষা প্রসঙ্গে যে বক্তব্য পেশ করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে CEDAW উক্ত বক্তব্যকে সাধুবাদ জানিয়েছে।এরই সাথে UN Women ও স্বয়ম যৌথভাবে নারী বৈষম্য দূরীকরন ও নারীর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

স্বয়ম এর বিভিন্ন কর্মসূচীর ফলে মন্ত্রী পর্যায়ের তরফে PWDVA (2005) এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কতগুলি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন

১) কাজে নিযুক্ত সমস্ত Stakeholder দের সক্রিয় ভূমিকা ও দায়বদ্ধতার প্রসার লাভ।

২) সরকারি তরফে PWDVA সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৩) PWDVA (2005) এর প্রসার ঘটাতে বিভিন্ন বেতার সম্প্রচারমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন ।

৪)PWDVA এর অধীনে সমস্ত Stakeholder দের জন্য "মহিলা সহায়িকার" প্রণয়ন যাতে যে কোন অঞ্চলে সংগঠিত যে কোন প্রকার নির্যাতন সংগঠনের সাথে সাথে মহিলারা উক্ত সহায়িকার মাধ্যমে উপযুক্ত স্থানে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন তার বন্দোবস্ত করা। যেসব মহিলা ও শিশুরা নির্যাতন ও বৈষম্যের মুখোমুখি হন,আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তাদের নানা রকম সহায়তা মূলক পরিষেবার প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা জানেন

[23] Swayam,(2014*),Empowering Women and Communities,a report*,p.31

না সাহায্যের জন্য আদতে কোথায় যেতে হবে।সহায়তা প্রদানকারী বিভিন্ন সংগঠন থাকলেও এই সম্বন্ধে তথ্য খুবই সীমিত ও সহজলভ্য নয় । সরকারি তরফেই যদি সহায়িকা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে সহজেই আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবেলা করা সহজতর হবে।

নাগরিক সমাজ ও স্বয়ম এর যৌথ প্রয়াসঃ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা স্থাপনের পাশাপাশি স্থানীয়, রাজ্য, জাতীয় এবংআন্তর্জাতিক পর্যায়ের নাগরিক সমাজের সাথে স্বয়ম যোগসুত্র স্থাপন করেছে।এ প্রসঙ্গে বলা যায় যাদের সাথে স্বয়মের সংযোগ ও সম্পর্ক বর্তমান সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো- West Bengal AMAN-Global Voice for Peace in the Home, South Asian Feminist Network, SANGAT, Muslim Women's Rights Network, Right to Food Network, মৈত্রী , ভাবনা সহ অন্যান্য নাগরিক প্রতিষ্ঠান সমূহ।

জাতীয় স্তরে স্বয়ম এর সাথে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে AMAN Network এর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।স্বয়ম এর বার্ষিক রিপোর্ট (April,2016) অনুযায়ী 2015 সালের 29 থেকে 31 মে [24]কলকাতায় এবং 2016 সালের 5 ও 6 ই জুলাই আসামের লুমডিং এ দুটি জাতীয় স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

2015 সালে কলকাতায় স্বয়ম জাতীয় পর্যায়ের আলাপ-আলোচনার জন্য সভার আয়োজন করে যেখানে ভারতের 10টি রাজ্যের 24 টি জাতীয় এবং 22 টি স্থানীয় সংগঠন অর্থাৎ মোট 46 টি সংগঠন অংশগ্রহণ করে। সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আলোচনার বিষয় ছিল কিরূপে কেন্দ্রীয় বাজেট নারীর অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। অন্যদিকে ঘরে কিংবা বাইরে যৌন নিগ্রহের শিকার হওয়া নারীদের সুরক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই বরাদ্দকৃত বাজেটের অর্থের পরিমাণ পরবর্তীতে হ্রাস করা হয়ে থাকে যার নেতিবাচক ফল এসে পড়ে নির্যাতিতার ওপর । এই সমস্যা নিরসনে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয় উক্ত সভায় ।

এছাড়া রাজ্যের বাজেটের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের করণীয় কি, আর্থিক সহায়তা সম্পর্কিত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান সহ শ্লীলতাহানীর শিকার হওয়া নারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রটোকল ও নিয়মাবলির প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয় উক্ত সভায়।

[24] Swayam,(2016),*Empowering Women and Communities,a report*,p.40

আলোচনার বিষয়বস্তু যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য স্বয়ম সদস্যরা দিল্লি ও কলকাতা শহরে সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে ।উক্ত সভায় মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকারান্তরে Protection Of Women from Domestic Violence Act (2005) এর সঠিক বাস্তবায়নকে সুরক্ষিত করা ।

অনুরূপভাবে 2016 সালের জুলাই মাসে আসামের লুম্‌ডিংয়ে "ঘারোয়া" আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় আটটি রাজ্যের মোট চব্বিশটি সংগঠন অংশগ্রহণ করে । কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভার মতোই এই সভায় আলোচনার বিষয় ছিল PWDVA (2005) এর যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন কৌশলের অনুসরণ ।

মৈত্রী -পশ্চিমবঙ্গে নারীর অধিকারের লড়াইয়ে একটি সক্রিয় নারীবাদী সংগঠন হলো মৈত্রী। মৈত্রীর বিভিন্ন সক্রিয় কর্মসূচীতে স্বয়ম যোগদান করে । মৈত্রীর সাথে যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে এই এনজিও সংস্থাটি বিভিন্ন প্রতিরোধ সভা, সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী , নারী নির্যাতন ও নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচনার আয়োজন প্রভৃতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সাম্প্রতিক সময়ে স্বয়ম ও মৈত্রীর যৌথ উদ্যোগে পরিবারের অভ্যন্তরে এবং তার পাশাপাশি[25] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে অত্যাচার ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত হয় এক প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচী।2016 সালের 31 ডিসেম্বর ব্যাঙ্গালোরে সংগঠিত শারীরিক অত্যাচারের প্রতিরোধ স্বরূপ মূলত এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। নাচ গান আবৃত্তি ও নাটকের মধ্যে দিয়ে জনসচেতনতার প্রসারের চেষ্টা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার শারীরিক নিগ্রহের ঘটনার উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি,কেবলমাত্র তাই নয়, স্কুলের অভ্যন্তরেও বাচ্চা শিশুর ওপর নির্যাতনের দৃষ্টান্ত আমাদের অজানা নয় । মৈত্রীর সদস্য হিসাবে স্বয়ম এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

আর্থিক সহায়তা লাভ-যে কোন সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তার অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্নভাবে স্বয়ম আর্থিক অনুদান লাভ করে।সংস্থার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়েও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসেন অনেক মানুষ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'স্বয়ম' এ নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দ,

[25] Interview by researcher,02/01/2019

স্বয়মে'র বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী , কয়েকটি স্থানীয় সংগঠন , এছাড়া অতীতে যারা স্বয়ম এর সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন তাদের একাংশও স্বয়ম'কে অর্থনৈতিক ভাবে সহযোগিতা প্রদান করে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে এই সংস্থা বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য এনজিও সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে, যার মাধ্যমেও স্বয়ম আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

স্বয়ম উপলব্ধি করেছে কেবলমাত্র মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেই সংগঠনের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসকে সফল করা সম্ভব নয়।বিভিন্ন কর্মসূচীতে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষদেরও অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় । হিংসামুক্ত ও লিঙ্গ সাম্য যুক্ত সমাজের গঠনে মহিলাদের সাথে সমান্তরালভাবে পুরুষের সচেতনতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। এই উদ্যোগের সফল রূপায়নের লক্ষ্যে 2016 সাল থেকেই স্বয়ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের ছেলেদের সাথেও কাজ করতে শুরু করে। এরা মূলত লিঙ্গ সমতার লক্ষ্যে কাজ করবে, সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে এরাই হবে 'পরিবর্তনের অনুঘটক' ।সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে সংগঠিত কন্যা ও মহিলাদের প্রতি যে কোন অত্যাচারমূলক আচরণ কে প্রতিহত করবে।

এই প্রক্রিয়ায় স্বয়ম এখনও পর্যন্ত 201 জন পুরুষ সদস্যকে নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 24 টি দল গঠন করেছে। একদিকে এদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ যেমন দেওয়া হয়েছে, একই সাথে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাদের মতামত জ্ঞাপনেরও সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। এই ২৪ টি দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা স্বয়মের আর্থিক সহায়তার আরেকটি উৎস। এছাড়া অর্থ সহায়তার লক্ষ্যে গঠিত 'Azim Premji Philanthropic Initiatives' ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 2016 সালে স্বয়মের একটি দল অর্থ সহায়তা লাভে টাটা স্টিলের সাথে যৌথ উদ্যোগে কলকাতা ম্যারাথনেও অংশ নিয়েছিলো।

<u>জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র</u>

পশ্চিমবঙ্গে এনজিও কার্যকলাপের আলোচনায় দ্বিতীয় যে সংস্থাটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেটি হল জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র।ভারতের মতো জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত,দরিদ্র দেশে বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা একান্ত জরুরি। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে প্রণীত সংবিধানের ১৫(৩) নং ধারায় নারী ও শিশুদের উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার পথে যাবতীয় বাধা বিপত্তি দূরীকরণের নীতি এবং ১৫(৪) নং ধারায় সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বাধানিষেধ

দূরীকরণের নীতি গ্রহণের ফলে ছেলেদের পাশাপাশি সব মেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে এই শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ অবৈতনিক। কেবল তাই নয়, এই লক্ষ্য পূরণে জাতীয় শিক্ষা কমিশনও গঠিত হয়। কিন্তু সমস্যা হোল, শিক্ষার প্রসারে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করলেও পরবর্তী দু-তিন দশকে ঘোষিত নীতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে শিক্ষাবিস্তারে আশানুরূপ ভাবে সফল হতে পারেনি সরকার। এর পাশাপাশি শিক্ষাবিস্তারে আর একটি বড় প্রতিবন্ধতকা ছিল সব জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের অসমতা।

এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল তুলনামূলকভাবে আরও খারাপ। একদিকে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, অন্যদিকে শিক্ষার অভাব কার্যতই সমাজের একাংশের মানুষকে পেছনে ফেলে গিয়েছিল। চাষ আবাদ ও দিনমজুরির মাধ্যমে কোনোভাবে দিন নির্বাহ সম্ভব হলেও, অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবে বালক-বালিকারা অনেক সময়ে স্কুলে ভর্তি হয়েও নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। এক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের সম্ভাবনাও ছিল কম। এই লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে আসে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র। ১৯৬৯ সালে, নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য বাস্তবায়নের আশায় জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র তার যাত্রা শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে এদের উদ্দেশ্য ছিল – গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদেরকে শিক্ষিত করে তোলা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিষেবা প্রদান, তবে এই সংস্থা মূলত মহিলা ও শিশুদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে এই সংস্থার কাজের ধরণ কিছুটা পাল্টেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার প্রসারের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচীর বাস্তবায়নে সহকারীর ভূমিকা পালন করছে অথবা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে রূপায়িত করছে।

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রের কর্মক্ষেত্র- [26]

(ক) আনুষ্ঠানিক এবং একইসাথে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে নিয়োজিত।

(খ) দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী প্রনয়ণ । একইসাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।

(গ) শিশুশ্রম প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ।

[26] Janasiksha prochar Kendra,annual report,(2015-2016)

(ঘ) শিশুদের পুষ্টিতে সাহায্য করা।

(ঙ) স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান।

(চ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রকল্প।

(ছ) ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিপদগ্রস্ত মহিলা ও মেয়েদের জন্য শেল্টার হোম এবং দুঃস্থ বয়স্ক নাগরিকদের জন্য বৃদ্ধাবাসের বন্দোবস্ত করা।

(জ) HIV আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নেশা আসক্তি, মানবপাচার প্রভৃতির মোকাবিলায় সদর্থক ভূমিকা পালন করা।

জনশিক্ষা কেন্দ্রের উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহের সফল বাস্তবায়নের জন্য ১৫০ এরও বেশী কর্মী নিয়োজিত। সর্বোপরি ২১ জন নাগরিক স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকায় এই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন।

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রের কর্মসূচীগুলিকে কর্মস্থলের পরিসীমার উপর ভিত্তি করে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে সংহতি কর্মপ্রকল্প এবং অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন কর্মসূচী।

এবার দেখে নেওয়া যাক গ্রামাঞ্চলে এরা কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রের দুটি ইউনিট রয়েছে। এদের মধ্যে একটি বাগান্ডা গ্রামে এবং দ্বিতীয়টি গনেশবাটী এবং প্রসাদপুর ভূমিজপাড়ায় অবস্থিত। বাগাণ্ডা গ্রামের ইউনিটটির মূল কাজ পরিষেবা মূলক। মূলত চার প্রকার পরিষেবা এখানে প্রদান করা হয়ে থাকে -- বৃদ্ধাশ্রম, স্বধার গৃহ, স্বল্পকালীন আশ্রয় এবং শিশুদের জন্য হোমের সুবিধাপ্রদান।

বৃদ্ধাশ্রম শব্দটি বহু মানুষের কাছেই আতঙ্কের। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হলেও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বার্ধক্যজনিত সমস্যা রয়ে গেছে। অধিকাংশ প্রবীণ নাগরিক সাধারণ পরিবারেই বসবাস করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই এদের ভরণপোষণ, চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব সন্তানদের উপরেই বর্তায়। কিন্তু বর্তমান যুগে সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা মানসিক বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে প্রবীণ মানুষেরা তাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ আশ্রয় ও বাসস্থান হারাচ্ছেন। সহায়, সম্বলহীন প্রবীণদের এই সমস্যা নিরসনে সহায়তার লক্ষ্যে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র ১৯৯৪ সালে বাগাণ্ডা গ্রামে বৃদ্ধাশ্রম

প্রতিষ্ঠা করে। বার্ধক্যজনিত সমস্যার মোকাবিলায় সরকারও বর্তমান সময়ে এগিয়ে এসেছে। এই প্রকল্পটি তৎকালীন ভারত সরকারের 'Ministry of Social Justice and Empowerment' এর অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয়। হোমটির প্রতিষ্ঠার সময়ে এর সদস্য ২৫ হলেও বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে [27]দাঁড়িয়েছে ১০ জন। এছাড়া এই ইউনিটে রয়েছে শিশুদের জন্য হোমের ব্যবস্থা।

স্বল্পকালীন আশ্রয় পরিষেবা: এই পরিষেবা কেবলমাত্র মহিলা এবং মেয়েদের জন্য। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় মহিলা এবং মেয়েরা পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা, মানসিক চাপ, সামাজিক শোষণমূলক আচরণ প্রভৃতির কারণে সামাজিক পরিসীমার মধ্যেও বিপদসংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। পরিবারের সদস্যরাও দায়ভার থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। ফলত এদের প্রকৃত অবস্থান কোথায় হওয়া উচিত সেটা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। এই সমস্যার নিরসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্তরে ভারত সরকার ১৯৬৯ সালে একটি প্রকল্পের সূচনা করে যার নাম দেওয়া হয় "Short Stay Homes for Women and Girls"। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট মহিলা ও মেয়েদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে সরকার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাছে অগ্রসর হয় যার মধ্যে একটি ছিল জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় পূর্বে উল্লেখিত বাগাণ্ডা গ্রামেই "স্বল্পকালীন আশ্রয়" পরিষেবার সূচনা হয়। অবমাননাজনক আচরণের শিকার হওয়া এবং সমাজচ্যুত মহিলা ও মেয়েদের (বিশেষত ১৫-৩৫ বছর বয়স্কা) সুস্থ ও সামাজিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে পুনরায় সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে সাহায্য করা অথবা শিক্ষা, দক্ষতাবৃদ্ধি কিংবা মানসিক স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাই ছিল এই "Short Stay Home Scheme" এর মূল উদ্দেশ্য। জনশিক্ষা প্রচার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ২৪৬ জন মেয়ের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। বর্তমানে এই স্বল্পকালীন আশ্রয় পরিষেবার অধীনে থাকা সদস্যের সংখ্যা প্রায় ২০ জন।

স্বধার গৃহ: এই বিষয়টির প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনার অবকাশ রয়েছে। ভারতের মতো বিপুলায়তন রাষ্ট্রের একটি অন্যতম সমস্যা হল অত্যধিক হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি। প্রতিনিয়ত যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বিষয়টি জাতির সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের বিষয়টি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার বিভিন্ন

[27] Interview by researcher,26/04/2019

জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করলেও জনবিস্ফোরণের সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে পারেনি। ভারতের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষেরা এখন দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করেন। অর্থনৈতিক অস্থিতাবস্থা, যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন নানারকম সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এর কুপ্রভাব এসে পড়ছে বিশেষ কিছু অংশের মহিলার উপর, উল্লেখ্য বিধবা মহিলা, পূর্বে সাজাপ্রাপ্তা মহিলা, শারীরিকভাবে নিগৃহীতা মহিলাদের একাংশ , পাচার হয়ে যাওয়া মহিলা/মেয়েরা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ঘরছাড়া, পরিবারচ্যুত হয়ে যাওয়া মহিলা প্রভৃতি। নানারকম জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলার মাধ্যমে এদের উদ্ধার করা হলেও পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার পর বহুক্ষেত্রেই এদের ফিরিয়ে নিতে নিজেদের পরিবারই অস্বীকার করে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে মানসিক স্থিতাবস্থায় ফিরে আসার পর এরা নিজেরাই গৃহে ফিরতে সম্মত হয়না। ফলে অধিকাংশ সময়েই এরা ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা দেহব্যবসার মাধ্যমে জীবনপাত করতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে এদের সন্তানেরাও এদের সাথেই অবস্থান করে, ফলত তাদেরও একটা দায়িত্ব মায়ের ওপর এসে বর্তায়। মূলত এই অংশের মহিলাদের জন্য ভারত সরকারের "Ministry of Women and Child Development" "Swadhar Greh Scheme" এর সূচনা করে। [28]২০০৫-০৬ চলতি বছরে এদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে "স্বধার গৃহ" প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্যগুলি হলঃ

(ক) প্রকল্পের আওতাধীন মহিলাদের প্রাথমিক প্রয়োজন যথা আশ্রয়, খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, চিকিৎসা পরিষেবা, দুঃস্থ ও যেসব মহিলাদের কোনো প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমর্থনের জায়গা নেই তাদের বিশেষ পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

(খ) অনেক সময় পরিস্থিতির ফলশ্রুতিতে এরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অর্ধমৃত প্রাণীতে পরিণত হয় যাদের নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজেদেরই বোঝার কোনো ক্ষমতা থাকেনা। এদের মনস্তাত্বিক কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা।

(গ) সমাজ কিংবা পরিবারে নিজেদের ন্যায্য অবস্থান ফিরে পাওয়ার জন্য নানারকম আইনি পরামর্শ দেওয়া ও সহায়তা করা এই Scheme এর অন্যতম লক্ষ্য।

(ঘ) Scheme এর আওতায় থাকা মহিলাদের অর্থনৈতিক ও মানসিক ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুত করে তোলা।

[28] Janasiksha Prochar Kendra,Annual report,(2oo6-2007)

(ঙ) দুরবস্থার শিকার হওয়া মহিলাদের সমর্থন লাভের অন্যতম মাধ্যম হল এই "স্বধার গৃহ" পরিকল্পনা। অনেক ক্ষেত্রেই এদের একাংশ মানসিক ভারসাম্যহীন কিংবা প্রতিবন্ধী ফলত তাদের প্রয়োজন কিংবা চাহিদা সম্পর্কে নিজেরাই বুঝতে পারেনা বা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারলেও প্রকাশ করতে পারেনা। "স্বধার গৃহ" প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মহিলাদের প্রয়োজন কিংবা চাহিদা বোঝার চেষ্টা করে এবং তার ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ।

(চ) প্রকল্পের আওতাধীন মহিলারা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে, অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তাদের জীবন শুরু করতে পারে তা সুনিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেয় "স্বধার গৃহ" কর্মপরিকল্পনা। ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত স্বধারের সদস্য সংখ্যার উর্ধ্বসীমা [29]ছিল ৫০ জন। এদের মধ্যে ৩২ জনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সফল হয়েছে। তবে বহু ক্ষেত্রেই যে বিষয়টি সমস্যার উদ্রেক করেছে তা হল হোমের অধিকাংশ মহিলা সদস্যই মানসিক বিকারগ্রস্ত, এদের সুস্থ হবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, ফলত পরিবারের কোনো হদিস অন্তত পক্ষে এদের থেকে পাওয়া যায়নি, একারণে এদের পুনর্বাসন আদৌ সফল হবে কিনা তা জোর দিয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না।

স্বধার গৃহের অন্তর্ভুক্তিকরনের পর কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন। ঊক্ত Scheme অনুযায়ী যে সব মহিলা গৃহনির্যাতনের শিকার তাদের সর্বোচ্চ এক বছর থাকার অনুমতি রয়েছে। অন্য ক্যাটাগরির দুঃস্থ মহিলারা সর্বোচ্চ তিন বছর স্বধারে থাকতে পারবেন। ৫৫ বছরের উর্ধ্বে মহিলারা ৫ বছর থাকতে পারবেন এবং পরবর্তীতে তাদের বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিত করতে হবে। মহিলাদের পাশাপাশি শিশু, পুত্র ও কন্যারাও স্বধারের পরিষেবা পাবেন। মেয়েরা ১৮ বছর পর্যন্ত এবং ছেলেরা ৮ বছর পর্যন্ত মায়েদের সাথে স্বধার গৃহে থাকার যোগ্য। বাগান্ডার গৃহে বর্তমানে "স্বধার হোম" এ বসবাসকারী সদস্যের সংখ্যা মোট ৮৮ জন যাদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ৮২ ও ছেলেমেয়ে মিলিয়ে মোট ৬ জন । প্রাপ্তবয়স্কদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে যেমন নিয়মিতভাবে মানসিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা, দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান মূলত শিশুদের, ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণে বিভিন্ন থেরাপির ব্যবস্থা, প্রভৃতি। অতীতে তারা যেসব বিপদের সম্মুখীন হয়ে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, "স্বধার" তাদের সেই পূর্বের সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে বদ্ধপরিকর।

[29] Interview by researcher,26/04/2019

West Bengal Social Welfare Advisory Board এর আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের গনেশবাটী ও প্রসাদপুর ভূমিজপাড়ায় "Rajiv Gandhi National Creche Scheme" এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুটি "ক্রেশ" প্রতিষ্ঠা করেছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ২৫ জন শিশু অন্তর্ভুক্ত আছে যাদের আশ্রয় দানের পাশাপাশি পুষ্টিদায়ক খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র তাই নয়, বিভিন্ন মডেল, চার্ট, চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাচ্চাদের স্কুল পূর্ববর্তী বিভিন্ন শিক্ষার আয়োজন করে এই "ক্রেশ কর্মসূচী"। একটা নির্দিষ্ট শতাংশের মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করায় এই "ক্রেশ পরিষেবার" চাহিদা প্রবল ফলত, অধিকাংশ সময় দুটি ক্রেশের আসন পূর্ণই থাকে।

Juvenile Justice Act : ভারতীয় সংবিধানের ১৫(৩), ৩৯(e), ৩৯ (f) ৪৫, ৪৭ নং ধারা অনুযায়ী শিশুর মৌলিক অধিকার এবং তার চাহিদা গুলি সঠিকভাবে পূরণ হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কর্তব্য। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর United Nations General Assembly শিশুদের স্বার্থে "Convention on the Rights of Child" গ্রহণ করে। কনভেনশনে কিছু লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় যেগুলি এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে মেনে চলতে হবে। যে সমস্ত শিশুরা বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার, সমাজে তাদের পুনরায় সংযুক্তিকরনের পাশাপাশি এদের সর্বোচ্চ স্বার্থ যাতে সুনিশ্চিত করা হয় তারও উদ্যোগ নেবে এই কনভেনশন। এই উদ্যোগেরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে ভারত সরকার CRC এর বক্তব্যে সহমত পোষন করে, মূলত Juvenile Justice সংক্রান্ত একটি নতুন আইন পাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।এই নতুন আইন United Nations এর কনভেনশনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ন হবে । ২০০০ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট "Juvenile Justice Act" [30]পাশ করে, সেই বছরের ডিসেম্বর থেকে আইনটি কার্যকরী হয়। মূলত বিগত বেশ কয়েক বছরের উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে অপরাধের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে; এদের মধ্যে নাবালকদের সংখ্যাও অনেক। বহুক্ষেত্রেই এরা খুন বা ধর্ষণের মতো বড়ো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। শিশুদের যে বয়সটা তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার সময় সেই পর্যায়ে তারা অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে, বিষয়টি বিকৃত মানসিকতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশুদের এরূপ বিপথে চালিত হওয়ার বিষয়টি বন্ধ করা উচিৎ এবং সেই লক্ষ্যেই ২০১৫ সালে ভারত সরকার আর একটি আইন পাশ করে যার মাধ্যমে 'Juvenile Crimes' এ নিযুক্ত অপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে।। কিন্তু সমস্যা হল অধিকাংশ কিশোর বা কিশোরী নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর মানসিক অসুস্থতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। একদিকে সামাজিক

[30] Ministry of Women and Child Development,Annual report,(2015-2016)

অবজ্ঞা অন্যদিকে পরিবারের অস্বীকৃতি সমস্যা আরো বাড়িয়ে তোলে। শারীরিক নিগ্রহের শিকার হওয়া কিশোরীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়েছে এই Act এর অধীনে। Red light Area তে শারীরিক নির্যাতনের কবলে আক্রান্ত কিশোরীদের পুনর্জীবন দানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর ১৯৯৮ সালে হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আক্রান্তদের মেন্টাল কাউন্সেলিং, শিক্ষাদান, পরিচর্যা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, দক্ষতাবৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।

সমাজকল্যাণ দপ্তরের নোটিফিকেশন অনুযায়ী {2118/1(200)}sw, dt 22.05.1998 অনুসারে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র হোম প্রতিষ্ঠা করে যেখানে ২৫ জন কিশোরীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত উক্ত হোমে অবস্থানকারী কিশোরির সংখ্যা ২২, যাদের অধিকাংশকে সরকারী সহায়তা প্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি করানো হয়েছে। পূর্বের তুলনায় অনেকটাই স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে এদের অনেকেই। সরকার Juvenile Justice Act এর আওতাধীন হোমগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। প্রায় প্রতি মাসেই জেলাস্তর থেকে একটি তদারকি টিম হোমের কার্যকলাপ সঠিক হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে আসেন। কেবলমাত্র তাই নয়, ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্র সরকারের Social Audit Cell [31]এর পক্ষ থেকেও সংশ্লিষ্ট হোমের পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছিল।

এই সমস্ত পরিষেবার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রয়েছে একটি Destitute Home, নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ, হোমের সদস্যদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, তারা মূলত সেলাইয়ের কাজ, শাড়ি কাঁটা, বোতাম তৈরির পাশাপাশি অন্যান্য হস্তশিল্পের কাজে নিযুক্ত। হোমের মেয়েদের জন্য নাচ ও আঁকা শেখানোর ব্যবস্থার পাশাপাশি খেলাধূলার আয়োজনও রয়েছে। মূলত বিভিন্ন পরিষেবার মাধ্যমে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুনিশ্চিতকরণে JJ Act Home প্রকল্পটি সরকার এবং জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রের এক শুভ উদ্যোগ।

শহরাঞ্চলে গৃহীত উদ্যোগ- জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র শহরাঞ্চলে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পথশিশুদের স্বার্থে Integrated programme of Street Children[32] প্রকল্পের বাস্তবায়ন। মূলত শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত রাষ্ট্রসঙেঘর কনভেনশন এবং একইসাথে Juvenile Justice(Care and Protection of Children), 2000 অনুসারে, শিশুদের

[31] Interview by researcher,26/04/2019
[32] Ministry of Women and Child Development,Annual Report,(2004-2005)

যে কোন প্রকার অত্যাচার ও শোষণ থেকে এই প্রকল্প সুরক্ষিত করবে এবং পথশিশুদের আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি পুষ্টিদায়ক খাদ্য, পরিচর্যা, শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যপরিষেবা সুনিশ্চিত করবে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল ও জনবহুল রাষ্ট্রে পথশিশুদের সংখ্যাও প্রচুর। ফলত সরকারের একার পক্ষে যাবতীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়, আর একারণেই NGO সহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে পথশিশুদের স্বার্থ রক্ষার্থে Integrated programme for Street Children সফল বাস্তবায়নে প্রয়াসী হয়েছে।

IPSC এর অধীনে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র পথশিশুদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে "ডে কেয়ার সেন্টার"-এর আয়োজন করেছে এবং কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৩১/০৩/২০১২ পর্যন্ত ৪০০ জন পথশিশু এই কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হয়েছে। সেন্টারে উপস্থিত বাচ্চাদের সঠিক শিক্ষাদান থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্যসহায়তা, খাদ্য বিতরণ, বিনোদনের ব্যবস্থা, এমনকী সাংস্কৃতিক উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

IPSC এর পাশাপাশি কলকাতার সল্টলেকে এই প্রোগ্রামেরই অধীনে ২০১১ সালের ১লা এপ্রিল [33]থেকে ওপেন শেল্টারের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত বিপদসংকুল পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এটি একটি বড়ো উদ্যোগ। সংশ্লিষ্ট স্থানে অবস্থানকারী মেয়েদের স্কুল শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি, কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা, কাউন্সেলিং, স্বাস্থ্য পরিষেবা, খেলাধূলার উন্নতি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি প্রভৃতির জন্য হোমের অধিকর্তারা বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকেন। জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যপরিষেবার অগ্রগতি, শিক্ষালয় প্রকল্প, প্রশিক্ষণ মূলক বিভিন্ন কর্মসূচী, উৎপাদন কেন্দ্র, নাইট শেল্টারের ব্যবস্থা, গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই সমাজের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম এবং সর্বোপরি Integrated child development scheme অনুসারে রেডলাইট এলাকা থেকে শিশুদের উদ্ধার করে 'অঙ্গনওয়াড়ী ' কেন্দ্রে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া। এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকার জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

JPK এর সচেতনতাবৃদ্ধি কর্মসূচী প্রসঙ্গে বলা যায় বিভিন্ন সময়ে নানারকম সামাজিক সমস্যাকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে অথবা উক্ত সমস্যা সম্পর্কে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে শহর ও গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিগত বেশ কয়েক বছরে যেসব সামাজিক বিষয়ে সচেতনতার

[33] Jana Siksha Prochar Kendra,Annual report,(2011-2012)

প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধে গৃহীত কর্মসূচী, বাল্যবিবাহ, HIV/AIDS সম্পর্কে, মাদকতা ও নেশা বিরোধী অভিযান, মানব পাচার, লিঙ্গবৈষম্য, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রের সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী সাধারণ মানুষের উপর অনেকটাই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। পঞ্চায়েত কিংবা ব্লক পর্যায়ে এদের যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ২০১১-১২ সাল নাগাদ ডানকুনি, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও ২০০৯ সালে গৃহনির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এই স্থানের পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত কমিটির সদস্যরা একজোট হয়েছিলেন। CPS এর অধীনে একদিকে গ্রামপর্যায়ে যেমন স্থানীয় কমিটি গঠিত হয়েছে অন্যদিকে জেলাস্তর থেকেও সভার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে অন্যান্য NGO প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

আর্থিক সহায়তার উৎসঃ সংস্থার সঠিক পরিচালনার অন্যতম একটি মাধ্যম হল এর অর্থনৈতিক উৎস। সংস্থার আয়তন যেমনই হোক না কেন তার নিয়ন্ত্রণ এবং অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। জনশিক্ষা প্রচারের প্রতিটি কর্মসূচীই সরকারের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় সংগঠিত। ফলত সরকারি অনুদানের একটা বিশেষ ভূমিকা এক্ষেত্রে বর্তমান। সরকার নির্দিষ্ট প্রকল্পের [34]জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে এবং উক্ত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের কিছু পরিমাণ অর্থ প্রকল্পে নিযুক্ত NGO প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে থাকে। জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এই আর্থিক সহায়তা অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি প্রকল্পের রূপায়ন করার নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত। সরকারি যে কোনো প্রক্রিয়াই সময় সাপেক্ষ, একথা অজানা নয়। ফলে অনেক সময়ই বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পে পৌঁছাতে অযথা বিলম্ব হয়, ফলে যে সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা, অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচীকে সচল রাখতে একারণেই অধিকাংশ সময়ে ব্যক্তিগত সহায়তা, নিজেদের স্বনির্ভর উদ্যোগ কিংবা অন্য কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সহায়তার উপর নির্ভর করতে হয়।

<u>সংযোগ</u>

তৃতীয় যে এনজিও সংস্থাকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটি হল সংযোগ।

[34]Interview by researcher,26/04/2019

মধ্য কলকাতায় অবস্থিত আর একটি সক্রিয় নন গভার্নমেন্টাল অরগ্যানাইজেশন হল সংযোগ।কেবল মাত্র ব্যক্তি বিশেষে এদের কাজ সম্পাদিত হয়না, সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় পরিসীমার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের সহায়তা মূলক পরিষেবা প্রদান এই সংস্থার মুল লক্ষ্য।ধনী দরিদ্র, নারী, পুরুষ, কিংবা কেন্দ্র অথবা প্রান্তিক মানুষেরা যাতে সমতা পূর্ণ জীবন নির্বাহ করতে পারে সেই লক্ষ্যে সংযোগ বিভিন্ন উদ্যোগ করে।বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশু নির্যাতনের চিত্র আমাদের অজানা নয়। পথ শিশু ,অনাথ শিশুর পাশাপাশি শিশু শ্রমিকের বহুল প্রচলন সমস্যাকে বহুগুনে বাড়িয়ে তুলেছে।ফলত সব দেশের সরকারই শিশু শোষণ ও অত্যাচার বন্ধ করতে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে।সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোও থেমে থাকেনি।সমাজ সচেতন বহু নাগরিগ শিশু নির্যাতন নিয়ে সরব হয়েছেন।এই আন্দোলনে সংযোগ ও সামিল হয়েছে।সমস্যার সমাধান কল্পে একদিকে যেমন বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তেমনই বিষয়টির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির দিকেও সংযোগ দৃষ্টি দিয়েছে।

সংযোগ মূলত Technical Resource Organisation হিসাবে কাজ করে থাকে।সামাজিক ন্যায় ও লিঙ্গ সমতা যুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কর্মরত অন্যান্য Non-Governmental Organisation কে বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

সংযোগ মনে করে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতীয় সমাজে নানা জাতি,ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষের মধ্যে বৈষম্য থাকলেও শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতি প্রত্যেকের সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। যে সব শিশুরা বৈষম্যের শিকার ,নানা ভাবে অত্যাচার কিংবা মানবিক অবমাননার শিকার তাদের প্রতি আলাদা ভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। সামাজিক ন্যায়ের অংশ হিসাবে বিচার প্রক্রিয়া যেন সবাইকে সমান নজরে দেখে তার নিশ্চয়তা প্রদানেরও প্রয়োজন রয়েছে।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে কোন রকম পক্ষপাতিত্বের ঘোরতর বিরোধিতা করে সংযোগ। অন্যদিকে সমসাময়িক কালে ভারত দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র। ফলত, সংযোগ আশা করে যে , সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রতিটি দেশের উচিৎ রাষ্ট্রীয় পরিসীমার উর্দ্ধে উঠে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি আক্রান্ত শিশুর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং শিশুর প্রতি সর্বপ্রকার অন্যায় , অত্যাচারের বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি সেটিকে বন্ধ করা। সংযোগ শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকে।এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষন মূলক কর্মকাণ্ডে

নিয়োজিত থেকে ভারতের অন্যান্য এনজিও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছে।

সংযোগ তার ঘোষিত লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা স্থাপনে বিশ্বাসী। Partnership স্থাপন থেকে শুরু করে ভবিষ্যতেও সম্পর্ক বজায় রাখতে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ আগ্রহী। কারন সংযোগ মনে করে যে , একমাত্র যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমেই যে কোন প্রকার লক্ষ্য পূরণে ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব।একারনেই সংযোগ বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করেছে। একদিকে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করেছে, অন্যদিকে কয়েকটি কর্পোরেট অফিসের সাথেও এদের যোগাযোগ বর্তমান। আবার পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে সরকারের সাথে 'সংযোগের' যোগাযোগ লক্ষ্য করা গেছে।এই সংস্থাটি বিভিন্ন কমিউনিটির শিশুদের অংশগ্রহণকারী ভূমিকার ওপর যেমন জোর দিয়েছে , পাশাপাশি এদেরকে নেতৃত্বের উত্তরসূরি হিসাবেও কল্পনা করেছে। অর্থাৎ ,এদেরকে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম মাধ্যম রূপে গণ্য করা হচ্ছে। সংযোগ আধিকারিকের বক্তব্যে এরকম ধারনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

সংযোগ মনে করে,সুশাসনের ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে হলে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের হাতে যে সব ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন। অনেক সময়েই এর মধ্যে নানারকম ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। স্বচ্ছতারও যথেষ্ট অভাব সেখানে রয়েছে। উক্ত সমস্যার আশু সমাধান আবশ্যক। সামাজিক ন্যায় সম্পূর্ণভাবে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে সংযোগ অন্যান্য Non Governmental Organisation সহ শিশু স্বার্থে কর্মরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য, ন্যায় ও সহমর্মিতার আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে বদ্ধপরিকর। শিল্প সভ্যতার অগ্রগতি ও বিশ্বায়নের ফলে সামাজিক উন্নয়ন হলেও প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের কতোটা অগ্রগতি হয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় বর্তমান। সমাজের অর্থনৈতিক , সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকে থেকে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর শ্রেণির সাথে সংযোগ কাজ করতে উৎসাহী।

এখনও পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে যেহেতু প্রবল তারতম্য রয়েছে সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরিয়ে স্ত্রী, পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, নাবালক,নাবালিকা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় নির্বিশেষে যাবতীয় বিভেদ ও ভীতির পরিবেশ দূর করার জন্য সংযোগ নানা পর্যায়ে সহযোগিতা স্থাপন করে থাকে।

আবার প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন বহু ক্ষেত্রেই নারী পুরুষ স্বাভাবিক সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতার জন্ম দেয়। নারী কিংবা পুরুষের সামাজিক চরিত্রায়ন মূলত সামাজিক অনুশাসন মেনেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে বেরিয়ে স্বাধীন জীবনের সুযোগ থাকেনা। সংযোগ এরকম Stereo-types এ ফাটল ধরাতে চায়, মানুষের চিন্তা ও মতামত প্রকাশের পক্ষে কথা বলে। শিশুর ওপর যে কোন প্রকার বৈষম্যমুলক আচরণের বিরোধিতা করে নতুনভাবে জীবন দর্শনের পথ দেখানোয় সক্রিয় উদ্যোগ নেয় এই এনজিও প্রতিষ্ঠানটি।

কর্মক্ষেত্র- প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সংযোগ মূলত দুটি স্থানকে এদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে [35]নিয়েছে। যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্র প্রদেশ।

কাজের প্রকৃতি- সংযোগের কাজের পৃথক পৃথক দিক রয়েছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়েরা নির্দিষ্ট সময় পর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। মূলত একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ায় ধরে নেওয়া হয় গৃহস্থালীর কাজই করবে।পরিবারের তরফ থেকেও কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। এমনকি তাদের অল্প বয়সে বিয়ের বন্দোবস্তও করে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট মেয়েরা তাদের ন্যায্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। মূলত এই অংশের মেয়েদের নিয়ে সংযোগ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়তঃপথ শিশুদের নিয়ে বহুদিন ধরেই সংযোগ আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় রকমের পরিচর্যার ব্যবস্থা করেছে।

তৃতীয়তঃ যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল, রেড লাইট এরিয়ায় বসবাসকারী মহিলাদের সন্তান প্রতিপালন।

চতুর্থতঃ ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং বিভিন্ন অস্থিতিশীল এলাকাগুলিতে বসবাসকারী শিশুদের বিরাট অংশ পাচারের শিকার হয়। বিভিন্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করলেও মূল সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ হয়নি।সংযোগ এই উদ্যোগে এগিয়ে আসে।

আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব সেখানে মহিলা এবং শিশু পাচারের হার সর্বাধিক। আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার তাগিদে

[35] Interview by researcher,10/02/2019

বহুসময় দেখা যায় অল্প বয়স্ক মেয়েদের প্রান্তিক অঞ্চলবর্তী জায়গা ছেড়ে শহরের দিকে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে।এই স্থানান্তরের ক্ষেত্রেই তারা দালালের শিকার হয়। কাজের সন্ধান এর নাম করে বহু ক্ষেত্রেই দালালদের একাংশ মেয়েদের পাচার করে দেয়।উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সব সময় তাদের উদ্ধার করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এই সমস্যার সমাধানে সংযোগ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

দলীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী থেকে শুরু করে তারা ব্যক্তিগতভাবেও মেয়েদের এবং মহিলাদের সচেতন করে তোলার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে তারা 'আওয়াজ' নামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে । পশ্চিমবঙ্গের 6 টি জেলা থেকে 40 টিরও বেশি প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। সামাজিক সচেতনতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আইনি সহায়তা এবং নির্যাতন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য সংযোগ সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্তরে অংশগ্রহণের পাশাপাশি অন্যান্য Non-governmental Organisation 'আওয়াজের' এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিল। মূলত ছটি সংগঠন এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিল যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মানুষের মধ্যে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। শিশু সুরক্ষা অথবা শিশু নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে বহু সময় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও রাজ্যস্তরে এই ধরনের উদ্যোগ খুব বেশি গ্রহণ করা হয়নি। এরই পাশাপাশি যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল সারা বিশ্বজুড়ে শিশু নিরাপত্তা নিয়ে এক ধরনের আন্দোলন চলছে উক্ত আন্দোলনে সামিল হয়েছে ভারতসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

নব্বইয়ের দশকে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সহ গোটা দুনিয়ায় উন্নয়নের জোয়ার এলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে উন্নয়ন প্রক্রিয়া কতখানি সফল হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে রাজনীতি এবং অর্থনীতি যে পরস্পর বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নিয়েই বিশেষ দ্বন্দ্ব বর্তমান। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংগঠিত হওয়া আদতেই সম্ভব নয়। ফলত মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং

রাজনৈতিক পরিবেশের সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে সামাজিক অগ্রগতিকে আরো সুনিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে সংযোগ বিশেষ আগ্রহী ।

সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী অল্পবয়স্কা মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা কাজ করে।নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য তাদের মধ্যে উপযুক্ত মেধা উপস্থিত থাকলেও তারা সেই বিষয়ে সচেতন নয়। স্বনির্ভর হয়ে ওঠার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।সংযোগ এমন একটি মঞ্চ তৈরি করতে চায় যেখানে মেয়েরা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে এবং এরই পাশাপাশি তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সক্ষম হবে।

2009 সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের 10 টি জেলার প্রায় 4094 জন মেয়েকে সংযোগ তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীতে সামিল করতে পেরেছে। এই কর্মসূচীর বিভিন্ন পর্যায়ে 40 জন শিক্ষানবিশ নেতৃত্ব প্রদান করেন।

22 টি এনজিওর পাশাপাশি 235 জন সমাজকর্মী মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনি সহায়তা, নারী [36]সুরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন নীতি এবং মেয়েদের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করে।

সহযোগিতার ক্ষেত্রঃ

পৃথক পৃথক ভাবে এবার দেখে নেওয়া যাক সংযোগ কাদের সাথে কি কি ধরনের কাজ করে থাকে-

ক) দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচীর মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সংস্থার উদ্যোগ।

খ) অন্যদিকে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে সংযোগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এমনকি দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির সমাধান কিভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠিত স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তারই পাশাপাশি বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে মানুষের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করে সংযোগ।

সমাজ কর্মীদের সাথে সংযোগ এর বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান ।এক্ষেত্রে যৌথভাবে তারা যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন বেআইনিভাবে মাইগ্রেশন,

[36] Interview by researcher,10/02/2019

মানবপাচার, বাল্যবিবাহ এমনকি শিশুর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণার প্রয়োগের পাশাপাশি শিশু নিরাপত্তা এবং শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

আমরা যদি সামাজিক স্তরবিন্যাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে সেখানে এক ধরনের Hierarchical সম্পর্কের উপস্থিতি রয়েছে। ফলত গ্রামাঞ্চলের মহিলা কিংবা মেয়েদের মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষমতা থাকলেও তারা যথাসময়ে সেগুলি প্রয়োগের অভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে না।এই বিষয়ে সংযোগ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মোবিলাইজেশন এর জন্য বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে।

শিশুর অধিকার এর সঠিক প্রয়োগ এবং শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে সংযোগ গঠন করেছে কয়েকটি ইউনিট এবং সংযোগ মনে করে যে, এই সমস্ত ইউনিট গুলিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

তবে শুধুমাত্র অংশগ্রহণই নয়।সমাজে এমন কোন নীতি যদি উপস্থিত থাকে যা তাদের স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে তবে সেই নীতির পরিবর্তনের জন্য তারা যৌথভাবে কাজ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে সংযোগ থেকে প্রাপ্ত আধিকারিকের একটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে,

" Many of this changes amongst adolescents to fight for justice,to dare to protest,to claim their rights were captured in the form of graphic novels in a series called 'Everyday Heroes''

২০০৯-১০ সালে সংযোগ একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে যার নাম "Karyaa"। [37]দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মেয়েদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সময় এই স্কুল ত্যাগ করে।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার যেসব গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সেরকম ভাবে এগোয়নি সেখান থেকে একটা বিরাট অংশের মেয়েদের শহরের দিকে চলে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।গ্রাম থেকে শহরের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যে ও মাইগ্রেশনের হার অনেক বেশি।তবে কেবলমাত্র মেয়েরাই নয় গ্রামাঞ্চলের এক বিশেষ অংশের পুরুষেরাও উপার্জনের আশায়

[37] Sanjog,'Prtnership,Empowerment & Resources to combat Trafficking in Children and Women',Annual report,(2013-2014)

নিজেদের জায়গা ছেড়ে শহরাঞ্চলে এবং অন্যান্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ একদিকে অল্পবয়স্কা মেয়েরা পরিস্থিতির শিকার হয়েই দিনমজুরের কাজ বেছে নিচ্ছে অন্যদিকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মূল সমস্যার জায়গা হলো কাজের ক্ষেত্রে গিয়ে এরা কতটা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ [38]করতে পারছে।ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রায় 70 থেকে 75 শতাংশ মানুষই গরীব যাদের মধ্যে এক বিরাট অংশের নারী কায়িক শ্রমেও নিযুক্ত।আবার কর্মে নিযুক্ত নারীদের বিপুল অংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত যার মধ্যে অন্যতম হলো কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া।কৃষি কাজে নিযুক্ত মহিলা মাত্রই চাষী একথা কিন্তু সঠিক নয়। যারা মজুরির বিনিময়ে অন্যের জমিতে ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ করেন তাদের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়।সর্বত্রই পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিকের মূল্য হয় কম। আর নারী শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই থাকেন প্রান্তিক শ্রমিক যারা বছরের ছয় মাসের বেশি কাজের সুযোগ পান না।

সংগঠিত শিল্প কারখানা গুলিতে এই নারীরা বহুল সংখ্যায় নিযুক্ত থাকেন।এখানেও নারীরা অনেক বেশি বঞ্চিত।সাধারনত তাদের নিয়োগ করা হয় শ্রমনিবিড় বিভাগে এবং অনেক ক্ষেত্রে আধা দক্ষ শ্রমিক রূপে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম।অন্যদিকে নির্মাণকাজের পেশায় নিযুক্ত নারীরা সম্ভবত কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পর সর্বাধিক শোষিত এবং বঞ্চিত।তাদের পারিবারিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে নারী শ্রমিকের মজুরি বিষয়ে দরকষাকষির কোন জায়গা থাকে না। দরকষাকষির অর্থ হলো সামান্য উপার্জনের সুযোগটুকুও হারিয়ে ফেলা।অর্থাৎ তারা নীরবে নিরুপায়ভাবে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে অনেক সময় এদের কাজ করতে হয় অস্থায়ী এবং ঠিকা শ্রমিক হিসাবে। এদের ছুটির কোন প্রশ্ন থাকে না এবং ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে একসময় এরা কন্ট্রাকটারদের হাতে বন্ডেড লেবার এ পরিণত হন।এই অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বহু Non governmental organisation বিশেষ রুষ্ট। এর মধ্যে সংযোগ অন্যতম।সরকারের তরফ থেকে এদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়না ফলে পরিস্থিতির অগ্রগতির বিশেষ সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

এই অংশের নারীদের জন্য বিশেষ কর্ম প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সংযোগ। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের উপার্জনের পথ প্রশস্ত করবে। গ্রাম অঞ্চলের নারীরা ব্যাপকহারে গৃহভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের পেশায় নিযুক্ত তা প্রায়

[38] বন্দ্যোপাধ্যায়,কল্যাণী,(২০১২),নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে;অন্ধকারে আলোর দিশা, কলকাতা, কে,মিত্র

সকলেরই জানা।তবে তারা যদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে আরো বেশি দক্ষ হন তবে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া সফল হবে।সংযোগ মনে করে লোকাল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাধীন উপার্জন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন সম্ভব।একদিকে উৎপাদন হবে এবং অন্যদিকে তার বাণিজ্যিক স্বার্থও সুরক্ষিত হবে।

এই প্রসঙ্গে সংযোগের 2009-10 এর বার্ষিক রিপোর্ট এর একটি তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে।এসময়ে কয়েকটি বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।যেমন,Vocational Training-Market research and feasibility-Setting up of structured enterprise and production units-Develpment into a community owned social enterprise- Market linkages and access with fair-trade organisations -Marketing and local market retail প্রভৃতি।

2009-10 সালে সংযোগ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী প্রণয়ন করে যার নাম ছিল [39]"Connecting, Coping, Caring"।পশ্চিমবঙ্গের সাতটি সংগঠনের পাশাপাশি জাতীয় পরিসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশের পাঁচটি সংগঠনও এই কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ রেখেছিল এবং এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি।

এই সময়ে শিশুদের জন্য সংযোগ আর একটি পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল যার নাম ছিল " Malamaal, a board game"।কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের অন্যত্রের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া এবং ফ্রানকোফোন দেশগুলির পাঁচ হাজারেরও বেশি শিশু এই গেমটি উপভোগ করে থাকে এবং ইংলিশ, হিন্দি,বাংলা,তেলেগু , নেপালি এবং ফরাসি মোট ছটি ভাষায় এটি উপলব্ধ।

2010 সালে সংযোগ "Childwise,a citizen's forum for children’s right to happiness"কে সমর্থন জানায়।

এর পাশাপাশি সংযোগের তরফ থেকে, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের ওপরে বিভিন্ন পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।এরকমই একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা কর্মসূচীতে মুখ্য নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন পারমিতা বন্দোপাধ্যায় এবং তার দুজন সহযোগী ছিলেন সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজয় নরসিংহ দেও।মানব পাচারের প্রশ্ন যদি আসে তাহলে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে।কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয় ভারতবর্ষের জাতীয় সীমানাবর্তী অঞ্চল এমনকি বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্বর্তী স্থানেও মানবপাচার অত্যন্ত গুরুতর একটি সমস্যা।এই গবেষণার মধ্যে দিয়ে গবেষকেরা যে সমস্যাগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরিবার

[39] Sanjog,Partnership empowering resource,2o1o

কিংবা সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন জায়গায় স্থানান্তরের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা সফল করতে গিয়ে মহিলা এবং মেয়েরা কিভাবে সেক্স ট্রাফিকিং এর শিকার হয় এবং সেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারেনা। সেক্স ট্রাফিকিং রোধে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হলেও সেগুলির সফল বাস্তবায়ন বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়না ফলে ট্রাফিকিং এর সংখ্যা সেভাবে কমিয়ে আনা বিশেষ সম্ভবপর হচ্ছে না।

উক্ত গবেষণার মধ্যে দিয়ে আরো যে কয়েকটি উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরবর্তী বছরগুলিতে কিভাবে এই ধরনের মানব পাচার বিশেষত নারী পাচার রোধ করা যায় এবং সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল কি কি হতে পারে।এরই পাশাপাশি কিছু সারভাইবার'দের পরিবারে কিভাবে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায় এক্ষেত্রে সরকার এবং এনজিও সংস্থা গুলির যৌথ ভূমিকা কি হতে পারে তার একটি বিশ্লেষন।এছাড়া উন্নয়নের পরিপেক্ষিতে এনজিও উদ্যোগ কতখানি সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়েও অনুসন্ধান চালানো হয়।

পরীক্ষামূলক গবেষণার মধ্যে দিয়ে মূলত সরকারের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাচার রোধে তো বটেই তবে পাচারের পর উদ্ধার হয়ে আসা মেয়েদের কিভাবে সুস্থ ভাবে তাদের পরিবারের সাথে যুক্ত করা যায় সে বিষয়ে সরকারের সদর্থক ভূমিকা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে এই মানব পাচারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো দারিদ্র্যতা।ফলত ফলাফলের দিকে চোখ না রেখে তার কারণ উন্মোচন করা সব থেকে বেশি জরুরি। এই বিষয়টির সমাধানের জন্য উক্ত গবেষণা সরকারকে কতগুলো প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ দেয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো NREGS Schemes,এবং Kishori Shakti Yojna।তবে নারী এবং শিশু কল্যাণ দফতরের অবশ্যই আরো প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।পাচার হয়ে যাওয়া মেয়ে কিংবা মহিলারা কতখানি পুলিশের সহায়তা লাভ করছে সেই বিষয়ে সরকারের আরো বেশি সজাগ হওয়া প্রয়োজন, এমন কি Anti Human Trafficking Unit এর কাছে স্থানীয় পুলিশ স্টেশন গুলিকে আরো বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেয় এই পরীক্ষামূলক গবেষণা কর্মসূচী ।

তবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কারকই নয়, এর পাশাপাশি ও অ-রাষ্ট্রীয় কারকগুলির মানব পাচার রোধে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের বিষয়েও আলোকপাত করে এই গবেষণা। প্রাথমিক পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে মূলত দুদিক থেকে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য প্রথমত, আর্থিক অনুদানের

যোগান এবং অন্যদিকে মানব উৎসের সন্ধান।মূলত দু রকম ভাবে এই সংস্থা কাজ করতে পারে এক হল 'Support Donor Funding Organisation' দ্বিতীয়তঃ NGO ও CBOs।
2009 সালে সংযোগ ফোকাস নামে একটি ডকুমেন্ট প্রকাশ করে তাদের মূল কর্মক্ষেত্র ছিল [40]Foot Soldiers at the Frontier,Bond Free এবং Perilal Passages ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে মাইগ্রেশনের দিক থেকে ভারতের মধ্যে দিল্লি এবং মহারাষ্ট্রের ঠিক পরেই তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ অবস্থান করে।2001 সালের জনগণনা অনুযায়ী 7 লক্ষেরও বেশি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এবং আর এক লক্ষেরও বেশি পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে।ফোকাস এর মধ্যে দিয়ে যে বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে তা হলো মাইগ্রেশন জনিত সমস্যার কারণে শিশুর জীবনের ওপর কি রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বিভিন্ন সময়ে সংযোগ পাচার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাগরিক সমাজের বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে যৌথ উদ্যোগ।কিন্তু সমস্যা হল সংযোগ যেখানে ট্রাফিকিং এর মতো গুরুতর সমস্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত সেখানে তার সহযোগীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না।মূলত স্থানীয় স্তরে সীমিত এনজিও সংস্থার মধ্যেই এই ধরনের মনোভাব দেখা যাচ্ছে। সংযোগ তার প্রকাশিত 'ফোকাস' নামক ডকুমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের 'সিবিও 'কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে এমনকি অর্থ সহায়তা প্রদানেও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

"Focus" এর পাশাপাশি 2010 নাগাদ আরো একটি গবেষণা চালায় যার নাম হল "Lets [41]Talk"।সামাজিক সংযোগের বিষয়টি কিভাবে শিশুর সুরক্ষায় সদর্থক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে মূলত সেই বিষয় নিয়েই গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 73 টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং এই গবেষণা অন্যান্য সহযোগী এনজিও এবং তাদের ডোনারদের মধ্যে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে কিংবা সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে আরো দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে পরামর্শ দেয়। মূলত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় যেখানে সংযোগের সহযোগী হিসাবে যারা কাজ করেছিল তারা হল বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি কেন্দ্র,গোকুলপুর সেবা সদন, উত্তর 24 পরগনা সাম্য শ্রমজীবী

[40] Interview by researcher,10/02/2019
[41] Sanjog,Partnership empowerment resource,2010

সমিতি, তেঘরিয়া ইনস্টিটিউট অফ সোশাল মুভমেন্ট এবং শেঠ বাগান মহিলা সমিতি ইত্যাদি।

" Lets Talk "এর মধ্যে দিয়ে কতগুলি বিষয় সামনে আসে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগের সুযোগ বৃদ্ধি। সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং নিরবচ্ছিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সরকার এবং এনজিও প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে যে আরো সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে সেই বিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

2011 সাল নাগাদ সংযোগের কর্মসূচীর মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাচার হয়ে যাওয়া মহিলাদের পুনরায় তাদের পরিবারের সঙ্গে সংযুক্তির ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া সমস্যার সমাধান। আক্রান্ত মহিলাদের নির্দিষ্ট সময় পর উদ্ধার করা গেলেও তাদের ফিরিয়ে আনা এবং তার পরবর্তী সময়ে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরের অবহেলার কথা আমাদের অজানা নয়। এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন থাকলেও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ কতটা দ্রুত হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না।

সাংগঠনিক স্তরে 2011 সালে জাতীয় পরীসীমা অতিক্রম করে সংযোগ এর পরিধি বিস্তৃত হয় এবং মূলত বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি এনজিও নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ এর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,অপরাজেয় বাংলাদেশ, Association for Community Development(ACD),Bangladesh Network of Women [42]Lawyers Association(BNWLA), Society for Social Service(SSS) এবং Rights Jessore প্রভৃতি।

তবে এত কিছুর মধ্যে সংযোগ গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো মাইগ্রেশনজনিত সমস্যা সম্পর্কে উদ্যোগ। 1947 সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও মাইগ্রেশন জনিত সমস্যার সমাধান হয়নি।ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে এই অনুপ্রবেশের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক।ভারতের আধিপত্য মেনেই মূলত বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল 1971 সালে।কূটনৈতিক এবং সামরিক উভয় দিক থেকে ভারত সাহায্য করেছিল বলেই পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ভারতের ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল হয়েও একটি প্রতিরোধক শক্তিতে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ লেগেই রয়েছে যার মধ্যে আছে মৌলবাদী বাংলাদেশের তাড়ায় ত্রিপুরায় চলে আসা চাকমা বৌদ্ধরা, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা হিন্দুরা এবং দারিদ্র্যপীড়িত কর্মপ্রার্থী

[42] Interview by researcher,10/02/2019

মুসলমানরা। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষের অন্যতম একটি কারণ হলো এই বেআইনি অনুপ্রবেশ। কেবলমাত্র রাজনৈতিক অশান্তি নয়, এটি আরো যে সমস্ত সমস্যা তৈরি করছে তারমধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল, শিশু এবং মহিলা যাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে সেক্সচুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কেবলমাত্র তাই নয় ছেলেদের ক্ষেত্রেও ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সীমান্ত অতিক্রম করে যারা কাজের সন্ধানে ভারতে প্রবেশ করছে তারা মূলত অপরাধী হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকে। ফলত সীমান্তরক্ষীরা যখন তাদের আটক করেন আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় মেনেই তাদের বিচার কার্য সম্পন্ন হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নাবালকদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে কাটাতে হয়।সীমান্তজনিত মাইগ্রেশন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সংযোগ কাজ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক যৌথ প্রয়াস- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শিশু সুরক্ষার লক্ষ্যে কাজের ক্ষেত্রে সংযোগ যে সমস্ত সংগঠনের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "Prajak" এবং BNWLA[43]।সংযোগ এক্ষেত্রে মনে করে যে, সীমান্ত অতিক্রম করে যারা ভারতে অনুপ্রবেশ করছে তাদের উদ্ধারের পর পুনর্বাসন এবং পুনরায় দেশে পাঠানোর যে আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে তাতে রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় কারকের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়।সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংযোগ জানায়, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিভাগ যে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই অনুপ্রবেশকারী নাবালকদের পুনরায় দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তা অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী এবং অনেক ক্ষেত্রে জটিলও বটে। অন্যদিকে সরকার এদের জন্য যে পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছে সেই পুনর্বাসন কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাবও পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের কোন সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনের বিষয়টিও সহজতর নয়। ফলত এক প্রকার বাধ্য হয়েই Non-governmental organisations এর ওপর এদের বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় যেটি সব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয় বলেই সংযোগ মনে করে।

এর পাশাপাশি আরও যে সমস্যা রয়েছে তা হলো হোমে বসবাসকারী নাবালকদের মোট সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অনুপস্থিতি। মুম্বাইয়ের একমাত্র একটি হোমেই এখনো পর্যন্ত সঠিক তথ্য রাখা হয়েছে এবং পরবর্তীতে সেটি মুম্বাই পুলিশকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কোন পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাছে এই সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই বলেই সংযোগ অনুমান করে। উপযুক্ত তথ্য,রেকর্ড এবং সরকারি গাফিলতির কারণেই বহু সময়

[43] Sanjog,Partnership,empowerment resource,2010

অসংখ্য নাবালক পুনরায় দেশে ফিরে যেতে সক্ষম হয়না এবং বহু ক্ষেত্রেই নানারকম শোষণমূলক অত্যাচারের শিকার হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সংযোগের অভিমত হলো বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশকারীদের উদ্ধার প্রক্রিয়া কিংবা পুনরায় দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উভয় দেশের সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।এর সমাধানের জন্য উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। কেবলমাত্র তাই নয়, যে সমস্ত ভারতীয় নাবালকেরা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই উদ্যোগ কাম্য।

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি

এবারে আসা যাক দূর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির আলোচনায়। প্রায় 65 হাজারেরও বেশি [44]যৌনকর্মীরা দুর্বারের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এরা মনে করে যে বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার থেকে সমাজ নানাভাবে এই যৌনকর্মীদের অধিকাংশকেই বঞ্চিত করে। এই সংস্থা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করতে চায় যেখানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ কিংবা পেশা নির্বিশেষে সমাজে সকলেই সমান অধিকারের দাবিদার।কিন্তু যে ধরনের সমাজে আমরা বসবাস করি সেখানে সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত নয় আর এখানেই দুর্বার এর উৎপত্তি।

দুর্বার এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন যার অন্তর্ভুক্ত হলো সমাজস্ত সকল যৌনকর্মীদের প্রাপ্য মর্যাদা,সম্মান,অধিকার লাভ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।এই লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে তারা সমাজে উপস্থিত বিভিন্ন রীতি, নীতি, চর্চা এবং অনুশাসন কে প্রভাবিত করতে চায়।সমবেত প্রয়াসের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নকে সম্প্রসারিত করতে চায়।ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে চায় এবং একই সাথে ব্যক্তি,সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে চায়।

সাধারণত যৌনকর্মীদের সম্মানের চোখে দেখা হয় না এমনকি এদের পেশা কেও স্বীকৃতি দেয়না আমাদের সমাজ।ফলত এই পেশায় যারা নিযুক্ত থাকেন তারা অনেকটাই সমাজ বহির্ভূত বলেই গণ্য হন। এটারই বিরোধিতা করে দুর্বার মহিলা উন্নয়ন সমিতি এবং মনে করে যে অন্যান্য মানুষের মতোই যৌনকর্মীরাও সমাজেরই অংশ এবং অন্যান্য মানুষের মতো তারাও বিভিন্ন অধিকার পাওয়ার সমান দাবিদার।

[44] DMSC,Quarterly report,2016

যে সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্বার কর্মরত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য,সংস্কৃতি, প্রশিক্ষণ মূলক কর্মসূচী ,মাইক্রো ক্রেডিট,খেলাধুলা,গবেষণামূলক কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণ এবং পাচার রোধ।

1995 সালে যৌনকর্মীদের অধিকার সুরক্ষার দাবি নিয়ে দুর্বারের জন্ম হয়।[45] প্রতিষ্ঠা লাভের অনতিবিলম্ব পরেই নাগরিক সমাজের মনোযোগ আকর্ষণেও দুর্বার সফল হয়।

দুর্বারের কর্মক্ষেত্রঃ দুর্বার এর কর্মক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপক। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। জাতীয়, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এই তিনটি ক্ষেত্রেই দুর্বার সক্রিয়ভাবে কর্মরত। দুর্বার এর কাজের ক্ষেত্র মূলত যৌন কর্মীদের ন্যায্য অধিকার এবং তাদের প্রতি যে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ করা হলেও অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্বার বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যে কোনো রকমের স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভের সুযোগ, এইচ আই ভি এবং উৎপাদনশীলতার সাথে যুক্ত অন্যান্য সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা লাভ ইত্যাদি ।

অধিকাংশ সময় যৌন কর্মীদের প্রতি নানারকম অবমাননাসূচক ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। এমনকি সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে তারা নানারকম শোষণের শিকার হয় বিশেষত পুলিশ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সহকর্মী কিংবা যাদের জন্য যৌনকর্মীরা কাজ করে থাকে সেই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে।দুর্বার যে কোনো রকমের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।এর পাশাপাশি যৌনকর্মী, তার পরিবার কিংবা সহযোগীর প্রতি যে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণের ও বিরোধিতা করে। যৌনকর্মীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দুর্বার বিশেষভাবে উদ্যোগী।

দুর্বার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত 22[46] বছর ধরে এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত।যৌনকর্মী এবং তার ক্লায়েন্ট এর মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।কেবলমাত্র তাই নয়,তাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলিতে যৌনকর্মীদের অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়ে দুর্বার বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপ এবং বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে যৌথভাবে গঠন করেছে "Anti Violence Forum" ।

[45] দুর্বার ভাবনা,২০১৪

[46] আন্দোলনের কথা,একটি দুর্বার প্রকাশনী ,২০১৭

1995 সাল থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের অন্যত্র দুর্বার সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে এশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথেও বিশেষ সহযোগিতামূলক ভূমিকায় উর্ত্তীন্ন হয়েছে দুর্বার।
সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দুর্বার বিশেষ সজাগ ,এ প্রসঙ্গে তার নির্দিষ্ট কিছু প্রকাশনী রয়েছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "অধিকার ভাবনা,নারী ভাবনার ২২ কথা,ভিন্ন নারী অন্যস্বর,চেনা দেশ অচেনা মানুষ" প্রভৃতি। এছাড়া দুর্বার প্রকাশিত বিভিন্ন বই এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "আন্দোলনের কথা,বাবুদের অন্দরমহল, Durbar-a brief profile,Mobilization and Empowerment, Join the Sex Workers Towards an Equal World, এবং দিনবদলের পালা প্রভৃতি। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রকাশিত দুর্বার এর উল্লেখযোগ্য বই হল 'আমাদের ও আ ক খ' এবং 'আমাদের শরীর ও যৌনরোগ'।অন্যদিকে পাচার প্রতিরোধে দুর্বার প্রকাশ করেছে "Self Regulatory Board"।এখনো পর্যন্ত দুর্বার 45 টিরও বেশি বই প্রকাশ করেছে এছাড়া 2009 সাল থেকে প্রতি মাসে "দুর্বার ভাবনা "নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।মাসিক পত্রিকায় মূলত সামাজিক,অর্থনৈতিক,সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অবশ্যই আলোচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র হল মহিলা৷

<u>এনজিও এবং সরকারের সহযোগিতার ক্ষেত্রঃ</u> - এনজিওর বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং সরকারের সাথে সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত বিষয়গুলো সামনে আসছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

১। এদের মধ্যে একটি অংশ সমাজের গঠনমূলক উন্নয়নের জন্য কাজ করে অন্যদিকে সমাজের শোষিত, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষদের সচেতন করে তোলে। অর্থাৎ একদিকে তারা যেমন প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে অন্যদিকে সমান্তরালভাবে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

২। স্থানীয় স্তরে কাজ করতে গিয়ে তারা অন্যান্য এনজিও সংস্থাগুলির সাথে একত্রিত ভাবে তৈরি করেছে এনজিও নেটওয়ার্ক।সমাজস্থ যে সব কাজ এককভাবে বাস্তবায়িত করা আদৌ সম্ভব নয়, সেসব ক্ষেত্রে সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্পে আত্মনিয়োগ করেছে।

৩। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি কিংবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তারা গঠনমূলক ভূমিকা নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে গঠন করেছে স্থানীয় সংস্থা।

৪। বড় মাপের এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং মাঝারি মাপের এনজিওকে অনেক সময় নানারকম তথ্য সরবরাহ করছে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও গুলির সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

৫। অনগ্রসর শ্রেণির শ্রেণী সচেতনতা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে।

৬। জনসাধারণকে এই উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে যে তারা যদি নিজেদের অধিকার প্রসঙ্গে সজাগ না থাকে তাহলে সরকার জনগণের প্রতি যতই দায়বদ্ধ হোক না কেন এই দায়িত্বের সঠিক বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব হবে না।

৭। সুতরাং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ বজায় রাখার প্রয়োজন আছে।

৮। শিক্ষা স্বাস্থ্য তো বটেই এর পাশাপাশি মহিলার ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে এনজিও সংস্থা গুলি।এনজিও আয়োজিত নানা রকম কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিজেরাই নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। আর এই ধরনের সাফল্যে অভিভূত হয়ে আরো বেশি সংখ্যক মহিলাকর্মীরা এনজিও সংস্থার সাথে যুক্ত হচ্ছে।

৯। শিশুর অধিকার সুরক্ষা, শিশু নিরাপত্তা, শিশু শ্রমিকের বিলোপ সাধন এবং সর্বোপরি সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইনের যথাযথ প্রয়োগ যাতে সুনিশ্চিত হয় সেই লক্ষ্যে এনজিও সংস্থাগুলি বিশেষ উদ্যোগী।

১০। বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী , প্রচার কিংবা প্রতিরোধের মাধ্যমে এনজিও সংস্থা গুলি সরকারি নীতি কে পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে যাদেরকে আমরা বলছি অ্যাডভোকেসি এনজিও।

১১। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা স্থানীয়ভাবে ঋণ দানের ব্যবস্থা করছে। এর ফলে হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প প্রসারিত হচ্ছে কিংবা মাইক্রো লেভেলে স্বাধীন উপার্জনের পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

এবারে দেখা যাক সরকারের সাথে পূর্বে আলোচিত এনজিও সংস্থাগুলির কি ধরনের সম্পর্ক বর্তমান-

১) রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে পঞ্চায়েতের প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে তার একার পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না।সরকার এক্ষেত্রে নিজেদের কাজের

সাথে এনজিওদের সরাসরি ভাবে যুক্ত করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উভয়ের মধ্যে এক ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যে সমস্ত বিষয়ে মূলত যৌথভাবে এরা কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুনর্বাসন, শিক্ষা,কৃষি,নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং পরিবেশ,পাচার রোধ প্রভৃতি। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র এবং "Ministry of Women and Child Development" এর যৌথ প্রচেষ্টায় গৃহীত "Swadhar Greh Scheme" কিংবা "West Bengal Social Welfare Advisory Board" এর উদ্যোগে "Rajiv Gandhi National Creche Scheme " প্রভৃতি।

২) "Juvenile justice act" এর অধীনে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ।

৩) এই যৌথ কর্মসূচীর অধিকাংশই সরকারি অনুদান নির্ভর। কিন্তু অনেক সময় সরকারি সাহায্য সঠিক সময় না পৌঁছানোর দরুন সংস্থাগুলি আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয় এবং ফলশ্রুতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মসূচী গুলির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না।

৪) অন্যদিকে বাল্যবিবাহ ও মহিলা পাচার রুখতে সরকার এবং এনজিওর যৌথ প্রয়াস অনেকটাই প্রশংসনীয়।কেন্দ্রীয় স্তর তো বটেই রাজ্যস্তরেও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে যৌথ প্রচেষ্টায় নানারকম কর্মসূচী তারা প্রণয়ন করেছে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। 2018 সালের শুরুর দিকে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় পুলিশের Criminal Department এর তত্ত্বাবধানে "Project Swayangsiddha" শুরু করা হয়েছে যাতে এগিয়ে এসেছে পাচাররোধে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি। এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো বাল্য বিবাহ এবং যথাসম্ভব পাচার প্রতিরোধ।উক্ত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য পুলিশের এই বিশেষ বিভাগটি রাজ্যের সব জেলায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

2016 সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা পুলিশ প্রথম এই প্রকল্পের সূচনা করলেও অনতিবিলম্বেই তা রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও সম্প্রসারিত হয়। প্রকল্পের মুখ্য প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছেন সিআইডির Inspector general আর তার সাথে সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছে নানা এনজিও প্রতিষ্ঠান। এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে যেটির মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক, পঞ্চায়েত কমিটির সদস্য মন্ডলী এবং বাবা-মায়েদের পাচারের ভয়াবহ ফলাফল সম্পর্কে অবগত করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেকটি বিদ্যালয় এবং পঞ্চায়েত গুলিতে "Swayangsiddha Box" গঠন করা হয়েছে। এর কার্যকারিতা হলো পাচার সংক্রান্ত ন্যূনতম সূত্রের আভাস পেলেই

অনতিবিলম্বেই তা পুলিশের কাছে পৌঁছাবে এবং সাথে সাথেই পুলিশ পাচার রোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে।

পূর্বে বাল্যবিবাহ কিংবা পাচার সংক্রান্ত কোন তথ্য সঠিক সময় পুলিশের কাছে না পৌঁছানোর দরুন বহু ক্ষেত্রেই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো না।কিন্তু পরিস্থিতির সমাধান পূর্বের তুলনায় সহজতর হয়েছে। নানা রকম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে আগের থেকে বেশি সচেতন করে তোলা সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয় স্কুলে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা এই উদ্যোগে যথেষ্ট সাহসিকতার ভূমিকায় এগিয়ে এসেছে এবং তথ্য সরবরাহ করছে। ফলে পুলিশের পক্ষে ও সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী 2018 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার প্রায় 70 জন পাচারকারী এবং 150 জনেরও অধিক মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ করা গেছে যা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

<u>এন জিওর ওপর প্রত্যক্ষ সরকারি নিয়ন্ত্রণ</u>

এতো গেলো সরকার ও এন জিওর সহযোগিতার আলোচনা। কিন্তু সব ক্ষেত্রে কি সম্পর্ক বজায় থাকছে? উত্তরে বলা যায়,অবশ্যই নয়। সরকার নিজের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সাফল্যমণ্ডিত করার এক মাধ্যম রূপে এনজিও সংস্থাসমূহকে ব্যবহার করছে।কারন বহু দেশের সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন বুঝে গেছে যে এন জিও প্রতিষ্ঠানগুলি উক্ত কাজে বিশেষ দক্ষ ,ফলে বেশ কিছু কাজ যেটা তারা করতে পারছেনা ,নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত কাজ সম্পাদনে অর্থের অপচয় হচ্ছে, যা অতি সহজেই কম খরচেই এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি করতে সক্ষম।স্বাভাবিক কারনেই সরকার নিজেদের প্রকল্পে এনজিওদের যুক্ত করছে। যেমন আগেই আলোচনার স্বার্থে উল্লেখিত সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পাশাপাশি গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ বিভিন্ন এনজিও'র সাহায্যে স্যানিটারি মার্ট, স্বল্প সঞ্চয় প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করছে।কিন্তু এতে অন্য সমস্যার জন্ম হয়েছে। দুর্নীতিজনত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, বহু ভুয়ো এনজিওর জন্ম হয়েছে যারা নির্দিষ্ট প্রকল্পের নাম করে সরকারের কাছ থেকে টাকা নিলেও পরবর্তীতে সঠিকভাবে কাজ করেনা।এই প্রসঙ্গে বলা যায় কাপার্ট প্রায় ৪০০ এরও বেশি এনজিও সংস্থাকে আর্থিক দুর্নীতির দায়ে এবং ভুয়ো পরিচয়ের কারনে কালো তালিকা ভুক্ত করেছে যদিও এখন এর সংখ্যা সঠিক ভাবে বলা মুশকিল।অন্যদিকে রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত বহু এনজিওর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে এবং মনে করা হয় এরা দেশ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। বিদেশী অনুদানের অর্থ সংক্রান্ত রিটার্ন স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রকের কাছে জমা না করায় ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৪৯৭ টি এনজিওর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া হয়। কারন অনেক সংগঠনেরই রেজিস্ট্রেশন থাকলেও তারা 'এফ সি আর' অনুসারে বিদেশী অনুদান পায়না,ফলে এরা মনে করে যে রিটার্ন জমা দেওয়ারও দরকার নেই।আবার অনেক সংগঠন তৈরির কিছু সময় পরে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে ফলত এরাও আর রিটার্ন জমা দেয়না।এই সমস্যাগুলো রয়ে গেছে।এই সমস্যা সমূহের নিরসনে কেন্দ্র সরকার এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেটি হল "NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI) AYOG" এর উদ্বোধন।

ভারতের কেন্দ্র সরকারের 'Think Tank' প্রকল্পের অধীনে নীতি আয়োগ এর সুচনা করা হয়। NGO DARPAN হল এমন এক মঞ্চ যার মধ্যে দিয়ে সরকার এবং Non Governmental Organisation অথবা Voluntary Organisations এর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হবে। পূর্বে এনজিও এবং সরকারি ক্ষেত্রের সম্পর্কের মধ্যেকার জটিলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ভারতের National Informatics Centre এর সাহায্যে নীতি আয়োগ এনজিও সংস্থাগুলির সুবিদার্থে সম্পূর্ণ বিনামুল্যে এই প্লাটফর্মের উদ্বোধন করেছে।

এন জিও দর্পণের মধ্যে দিয়ে একদিকে সরকার ও এনজিও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি হবে , একইসাথে এনজিওর বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। এছাড়া সংস্থার কাজের ওপর প্রত্যক্ষ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন এরা কাজের প্রতি অনেক বেশি দায়িত্বশীল হবে , স্বাভাবিক ভাবেই কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে সরকারের অভিমত।মূলত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবোধনে এনজিও ও সরকারের মধ্যে সুস্থ ও কার্যকরী সম্পর্ক তৈরির লক্ষ্যেই উক্ত প্রকল্পের সূচনা।

প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পাশপাশি এই উদ্যোগে যারা সরাসরি যুক্ত তারা হলেন ভারত সরকারের প্রধান তথ্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের আওতাধীন National Informatics Centre (NIC) Ministry Of Electronics & Information Technology (MeitY) ইত্যাদি।[47]

সরকার থেকে যে কোন প্রকার গ্রান্ট , ফান্ড মঞ্জুরের আবেদনকালে কিংবা সরকারী কোন প্রকল্পের আওতায় কর্মরত এন জিও প্রতিস্থানগুলিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠানো কিংবা প্রকল্পের সমাপ্তিতে যাবতীয় তথ্য প্রেরণ, এর সবটাই " নীতি আয়োগের " অন্তর্গত।

এবার দেখা যাক এনজিও দর্পণ প্লাটফর্মের অন্তর্গত বিষয়গুলি কি কি?

[47]Report of Government of India,niti ayog,(2018)

ক) সর্ব প্রকার এন জিও সংস্থার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নীতি আয়োগের অন্তর্গত।

খ) সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগের কাজের জন্য অর্থ মঞ্জুর।

গ) এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের সুবিদার্থে 'মোবাইল অ্যাপের' সুবিধা।

ঘ) GIS নির্ভর রিপোর্ট পাঠানোর সুযোগ।

ঙ) PFMS এর সংযুক্তিকরণ।

এবার দেখা যাক "নীতি আয়োগ দর্পণ" এর আওতায় এন জিও সংস্থা গুলির করনীয় বিষয়গুলো কি কি?

ক) সম্পুর্ন নিয়ম মেনে এনজিও প্রতিষ্ঠান গুলির নথিভুক্তিকরণ হবে।প্রতিটি এনজিওর পৃথক পৃথক রেজিস্ট্রেশন আইডি থাকবে।

খ) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে অর্থ মঞ্জুরের আবেদনের প্রক্রিয়া পৃথক ভাবেই সম্পন্ন হবে। এক্ষেত্রে দর্পণ পোর্টালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সাইটে গিয়ে উক্ত আবেদন জানাতে হবে এবং এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের এক্ষেত্রে কোন যোগাযোগ থাকবেনা।

গ)এন জিও দর্পণ পোর্টালে নাম নথিভুক্তকরনের সময়েই প্রত্যেক এনজিওর পৃথক প্রোফাইল বানাতে হবে যার মাধ্যমে কাজ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সরকারকে জানাতে হবে।

ঘ) এছাড়া প্রদত্ত ' মোবাইল অ্যাপ' টির সাহায্যে আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত যে কোন প্রকার তথ্য সরকারকে জমা করতে পারবে এন জিও সংস্থার কর্মীরা।

এন জিও-দর্পণের গঠনে সরকারের কি কি সুবিধা হয়েছে সেটাও এক নজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে-

ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শুরু করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদ , রাজ্যের সব জেলার জেলা আধিকারিক , অনান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিসারের পাশাপাশি সি ই ও এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এনজিও সম্পর্কিত সব রকমের তথ্য লাভে সক্ষম হয়েছেন।

খ) পোর্টালের সাহায্যে অর্থ মঞ্জুর সম্পর্কিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার সম্পাদন সহজতর হয়েছে।আলাদা আলাদা মন্ত্রকের কাজের বিভাজিকরন থাকার ফলে জটিল প্রক্রিয়াটির কাজে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে উক্ত পোর্টালের মাধ্যমে।

মূলত ১৯৫৬ সালের "Indian Companies Act " এর অধীনে সরকার এই প্রকল্পের সূচনা করেছে।এনজিও দর্পণ পোর্টালে নথিভুক্তিকরনের সময় সংশ্লিষ্ট এনজিও'র যাবতীয় বিবরণের যেমন প্রয়োজন একইসাথে এনজিও কর্মকর্তার 'নাগরিক পরিচয় পত্র ' অথবা PAN Card. ADHAR Card এর সব তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক।ফলে ভুয়ো এনজিওর নথিভুক্তিকরণের সুযোগ "নীতি আয়োগে" অনুপস্থিত।

তবে সুবিধার প্রশ্ন বাদ দিলে যে বিষয়টি নজরে আসে তা হল, যদি ধরে নেওয়া হয় এনজিও তার গঠন থেকে শুরু করে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ,সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেদের বিভিন্ন নিয়ম নীতি মেনেই এদের কর্মসূচী সম্পাদিত হয়,তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় NGO-DARPAN PORTAL তাদের এই স্বাতন্ত্রের জায়গায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। যেটি কোন ভাবেই কাম্য নয়।সরকার এন জিও দর্পণের সাহায্যে এন জিও প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রের জায়গা কি খর্ব করছেনা? সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গে এনজিওর কার্যকলাপ ও সরকারি ক্ষেত্রের সাথে এদের সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।প্রথমে এনজিও প্রসঙ্গে সাধারণ ধারণা তুলে ধরা হয়েছে, দ্বিতীয়ত একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পশ্চিমবঙ্গে ক্রিয়াশীল নির্দিষ্ট কয়েকটি এনজিও সংস্থার কার্যাবলী এবং সরকারের সহিত উক্ত এনজিওদের সম্পর্কের গতি প্রকৃতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার শুরুর দিকে এনজিওর সংস্থার উৎপত্তি, বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সমুহের অবতারনা করা হয়েছে।শিল্প সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়নের ধারণার উল্লেখের মধ্যে দিয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে এনজিও সংস্থার উদ্ভবের কথা আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমের উন্নত এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্নুনত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক বৈসাদৃশ্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার কারনবশত সরকারী এবং বেসরকারি ক্ষেত্র ব্যতীত ""তৃতীয় ক্ষেত্র" রূপে এনজিও সংস্থাকে গণ্য করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যায় দীর্ঘদিন যাবত ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার পর ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়।একদিকে জাতি গঠনের সমস্যা অন্যদিকে অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই প্রতিপন্ন করে।এমতাবস্থায় সরকার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের সাধারণ নাগরিকদের উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করে।তবে এর ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

একদিকে জনবহুল ভারতবর্ষে সংগঠিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা অন্য দিকে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ সরকার প্রাথমিক চাহিদা পূরণেও ব্যর্থ হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই এক বা একাধিক কেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল যারা মূলত প্রান্তিক মানুষদেরই শোষণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের শ্রী-বৃদ্ধিতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এর ফলে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গৃহীত হলেও তাতে প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষদের পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল বৈষম্যমূলক এবং রাস্ত্রব্যবস্থার ভুমিকা ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

রাষ্ট্রব্যবস্থার এই দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে এনজিওদের উৎপত্তি। এছাড়া নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সামাজিক সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে যেখানে সাধারণ মানুষের অবাধ প্রবেশ এবং সংস্থার অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপস্থিতিও বর্তমান, যা উক্ত সংস্থার কাজকে সহজতর করেছে।

প্রথমদিকে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডেই এদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে যুক্ত হতে থাকে। অর্থাৎ পূর্বের স্বেচ্ছাসেবামূলক ভুমিকায় কেবলমাত্র নিয়োজিত না থেকে সামাজিক পুনর্গঠনে প্রয়াসী হয়।

১৯৯০ এর প্রথমার্ধ থেকে এনজিওদের কাজের অভিমুখের যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনই কাজের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীতে এদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারী নীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে এদেরই একাংশ।

তবে তা সত্ত্বেও সরকারী তরফেও এনজিও সহায়তা লাভের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।এই লক্ষ্যেই ২০০০ সালে ভারত সরকার Nodal Agency গঠন করে।এদের অর্থ সাহায্য লাভে সুবিধা প্রদানে ২০০৭ সালে কেন্দ্র সরকারের মন্ত্রী পরিষদ Central Social Welfare Board , National Westeland Development প্রতিষ্ঠা করে।

কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যস্তরেও এনজিও ও সরকারি ক্ষেত্রের সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়েছে।সরকার স্থানীয় পর্যায়ে উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। শিক্ষা , স্বাস্থ্য ,নারী কল্যাণ ,পরিবেশ সংরক্ষণ , শিশু শ্রমের বিলোপ সাধনে রাজ্য স্তরে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে যেখানে এনজিও সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রান্তিক স্তরের কাজের ক্ষেত্রে এনজিওদের সাফল্যের যথেষ্ট নজির রয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে ক্রিয়াশীল এনজিওদের বিভিন্ন কর্মসূচীর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হল এদের একটি অংশ সমাজের গঠনমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সাথে যেমন যুক্ত হয়েছে তেমনই বেসরকারি পর্যায়েও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।এছাড়াও সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিতেও ইতিবাচক ভুমিকা পালন করেছে।

গবেষণায় উত্থিত প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করা,অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজস্থ সকল মানুষকে সামিল করা, কেন্দ্র ও প্রান্তিক সব স্তরের মানুষের মধ্যে সরকারী পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ায় এদের একটা অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ,নারী সুরক্ষা,শিশু শ্রমিকের বিলোপসাধনে সরকার ও এনজিও প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে দক্ষতার সাথে কাজ করেছে।

অন্যদিকে এনজিওদের একটা অংশ নারী সুরক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।একদিকে নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীতে এদের অন্তর্ভুক্ত করেছে অন্যদিকে নারীকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করারও উদ্যোগ নিয়েছে।এক্ষেত্রে "স্বয়ম" এর উদাহরণ দেওয়া যায়।

এছাড়া সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে সাধারন জনগণকে নিজেদের অধিকার আদায়ের উপলব্ধিতে সাহায্য করেছে কয়েকটি এনজিও।শিশু সুরক্ষা,শিশু নিরাপত্তা সহ শিশু শ্রমের বিলোপ সাধনে অগ্রসর হয়েছে।সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আইনের সফল বাস্তবায়ন ও সুনিশ্চিতকরনে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। সরকারী দায়িত্বের সফল রূপায়নের বিষয়টির সুনিশ্চিতকরনের জন্য এনজিওদের একটা অংশ ক্রমাগত সরকারী প্রক্রিয়ার ওপর চাপ তৈরি করে চলেছে। এদের উদ্দ্যেশ্য হোল সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন নীতি জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী না হলে তার পরিবর্তনের চেষ্টা করা।

এরই পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পে এনজিও ও সরকার যৌথভাবে কাজ করছে। যৌথ কর্মসূচীর অধিকাংশই সরকারী অনুদান নির্ভর। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই Ministry of Women and Child Development এর "Swadhar Greh Scheme' West Bengal Social Welfare Advisory Board এর 'Rajiv Gandhi National Creche Scheme' এর উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এনজিও ও সরকারের সহযোগিতার ক্ষেত্র বাদ দিলে বিরোধেরও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করলেও এদেরই একটা অংশ সরকার বিরোধিতায় অগ্রসর হয়েছে।এই বিষয়ে এদের অভিমত হল ভারতে সরকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ।পরিষেবা প্রদান থেকে শুরু করে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহও জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া বাঞ্ছনীয়।সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সর্বদাই যোগসূত্র থাকা উচিৎ। এই বিষয়ের বাস্তবায়ন যথাযথ না হলে অবশ্যই সরকার বিরোধিতার প্রয়োজন আছে।

এনজিওদের একটা অংশ মনে করে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরকারী ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হল জনগণ এবং সরকার প্রসূত বিভিন্ন নীতিও জনগণের স্বার্থেই গৃহীত হয়।শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই আইনের প্রয়োগ এবং সাধারণ মানুষও উক্ত আইন মেনে চলতে বাধ্য।ফলত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে নীতি নির্ধারণ ও আইন রূপায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা ঘটেনা। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষেরই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে কোনোরকম সংযোগ নেই ,সংযোগ তো দূরের কথা ,অনেকেই এই বিষয়ে অবগত নন।এই কাজে এগিয়ে এসেছে এনজিও সংস্থা গুলি। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে নানারকম সভার আয়োজন করেছেন। নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার পর উপস্থিত জনসাধারণের মতামতো একত্রীকরণের মাধ্যমে অন্য কোন বড় মাপের এনজিও অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়।গৃহের অভ্যন্তরে বধূ নির্যাতন থেকে শুরু করে কর্মস্থলে নারীর ওপর অবমাননামূলক অত্যাচার রোধে বিভিন্ন আইন প্রণয়নে এই ধরণের পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন সংযোগ নামক এনিজিও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জানান ২০১৩ সালে সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে এরকমই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অনেকসময় পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে পাচার হয়ে যাওয়া মহিলা কিংবা শিশুদের ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে উদ্ধার করার পর ভারতীয় নাগরিগত্ব না থাকার দরুন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে এদের পুলিশের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়। পুলিশ প্রশাসন অনুপ্রবেশকারীর সাথে কথা বার্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে উক্ত ব্যক্তিকে দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেয়।কিন্তু সমস্যা হল অধিকাংশ সময়েই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়না।এর পাশাপাশি অনির্দিষ্ট কাল যাবত আটককারিকে পুলিশি হেফাজতে রাখাও সম্ভব পর নয়।অথচ এই বিষয়ের সমাধানের জন্য সহজ কোন প্রক্রিয়া নেই। এই উপলক্ষ্যে উক্ত এনজিও প্রতিষ্ঠানটি মাইগ্রেশন সংক্রান্ত আইনের সরলীকরণের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে একটি লিখিত দলিল পেশ করে ।যদিও পরবর্তীতে তার বিশেষ কোন সুরাহা হয়নি বলেই তিনি জানান।এরকম ভাবেই এনজিও প্রতিষ্ঠান সমূহ নীতি নির্ধারণ অথবা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। আবার গৃহের অভ্যন্তরে নারী নির্যাতন রোধে ২০০৫ সালে সরকার 'Protection of Women from Domestic Violence Act' পাশ করলেও প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বধূ নির্যাতনের সংবাদ আমরা পাই। অর্থাৎ নির্যাতন রোধে আইন পাশের মধ্যে দিয়ে সরকার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও আইন প্রণয়নকারী কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট দুর্বলতা

রয়েছে। দৈনন্দিন বধূ নির্যাতনের ঘটনা সে কথাই প্রমাণ করে। একাজে বিভিন্ন এনজিও সংস্থা সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। নির্যাতন বন্ধের পাশাপাশি নির্যাতন সংগঠনের পরবর্তী সময়ে নির্যাতিতা মহিলারা যাতে PWDVA(2005) এর অধীনে উপযুক্ত বিচার পান তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সহায়কের ভূমিকায় দেখা গেছে এনজিও সংস্থাগুলিকে।এক্ষেত্রে স্বয়মের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

তবে সরকার ও এনজিও কর্মকান্ডের মধ্যে বিরোধের অন্যান্য উপাদানও উপস্থিত।বিভিন্ন সরকারি কার্যকলাপ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে,সব ক্ষেত্রে এনজিও হস্তক্ষেপকে সরকার সুনজরে দেখছেনা।এক মাত্র যেসব ক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচীতে এনজিও সহায়তা অনুভূত হচ্ছে কেবলমাত্র সেখানেই সহযোগিতা লক্ষ্য করা গেছে। এনজিওদের স্বাধীন ও স্বায়ত্তের জায়গা নিয়ে সরকারের দ্বিমত রয়েছে। সমস্ত এনজিওদের সাধারনত Society Registration Act , Trust Act , Company Registration Act (25) এর আওতায় নথিভুক্তিকরণ থাকলেও এতে সরকার সন্তুষ্ট নয়।প্রত্যক্ষ নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একারনেই 'এনজিও-দর্পণের' সূচনা করেছে যা পরোক্ষভাবে এনজিওর স্বাধীনতাকেই খর্ব করছে।

অন্যদিকে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সাক্ষাতকারের মধ্যে দিয়ে যে বিষয়টি জানা গেছে তা হল সরকারের আর্থিক অনুদান প্রদানে অসহযোগিতার অভিযোগ। বিভিন্ন যৌথ প্রকল্পে সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন এবং এক্ষেত্রে এনজিও সংস্থার অভিযোগ হল নির্দিষ্ট প্রকল্প এনজিওদের হস্তান্তরিত করলেও সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা তারা পান না।আবার গৃহীত কর্মসূচি মাঝপথে থামিয়ে দিলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।একারনে অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে উক্ত সংস্থাকে অন্য কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে সহায়তা লাভে অগ্রসর হতে হয়।এটি নিঃসন্দেহে এনজিও-সরকার যৌথ কর্মসূচীর নেতিবাচক দিক। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার দরুন এনজিও এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এই সহযোগিতার বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

এনজিওদের কাজের ক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় একটি বিষয় হল,কয়েকটি এনজিও সংস্থা তাদের আর্থিক যোগানের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে কিংবা সরকারের সহিত,বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে কোনও প্রকার যোগাযোগ আছে কিনা সে বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে নারাজ।যেটি সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতার প্রতি খানিকটা নেতিবাচক ইঙ্গিতই প্রদান করে।তবে সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্র সরকারের 'NITI Ayog Portal' এর অধীনে এনজিও-দর্পন এর সুচনার মধ্যে দিয়ে সরকার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের

মাধ্যমে এনজিও কার্যকলাপকে কতখানি প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে তা ভবিষ্যতই নির্ধারণ করবে।

BIBLIOGRAPHY

1. Khan, Azeez Mehdi.(1997),*Shaping Policy:Do NGOs Matter*? ,New Delhi:Participatory Research in Asia

2. Weiner,Myron,(1991),*The child and the state in India,*United Kingdom:Princeton University Press

3. Deb,Arun.(2000),"The UCRC:Its Role in Establishing the Rights of Refugee Squatters in Calcutta*",in Refugees in West Bengal,Institutional Practices and Contested Identities,*Calcutta,Mahanirban Calcutta Research Group

4. Green,A.and Matthias,A.(1997),*Non-Governmental Organisation and Health in Developing Countries* ,London,Macmillan Press,

5. Agarwal,S.N.(1972*),India's Population Problem*,New Delhi,Asia Publications

6. DMSC,Quarterly report,2016

7. Report of Government of India, NITI Ayog(2018),New Delhi

8. Jana Siksha Prachar Kendra,annual report,(2011-2012)

9. Sanjog,Partnership Empowerment Resource, 2010

10. Swayam,(2016),*Empowering Women and Communities,a report,*

11. Chatterjee,Nilanjana.(1992),*Midnight's Unwanted Children:East Bengali Refugees and the Politics of Rehabilitation,*Rhode island:Brown University

12. *Report of the Ministry of Rehabilitation* ,(1961),New Delhi

13. Bandopadhyay, Sandip.(2000),*Millions Seeking Refugee:The Refugee Question in West Bengal:1971*,Calcutta:Mahanirban Research group

14. Singh, Anil K(1995),*Towards strategic networking:an experience*,New Delhi,Vani

15. সিনহা,ডঃসুজিত,(২০০৫),"*বিকল্পের সন্ধান ও এনজিও*",*উন্নয়নের খোঁজে এনজিও,* কলকাতা ,ডেভ্লপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার

16. মুখোপাধ্যায়, অমিতেশ. (২০০৫)*"একটি অভিজ্ঞতার গল্পঃএনজিও কতটা রাজনৈতিক" ; উন্নয়নের খোঁজে এনজিও* ,কলকাতা,ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার

17. বন্দ্যোপাধ্যায়,কল্যাণী,(২০১২),*নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে;অন্ধকারে আলোর দিশা,* কলকাতাঃ কে,মিত্র

18. আন্দোলনের কথা,(২০১৭), একটি দুর্বার প্রকাশনী

19. দুর্বার ভাবনা,২০১৭

20. বন্দ্যোপাধ্যায়,কল্যাণী,(২০০৯), *রাজনীতি ও নারীশক্তিঃ ক্ষমতায়নের নবদিগন্ত* ,কলকাতাঃগ্রন্থমিত্র

পরিশিষ্ট

প্রশ্নাবলী

ক) এনজিওদের কাজের ক্ষেত্র গুলো কি কি?

খ) কোন কোন অঞ্চলে এরা কর্মরত?

গ) এনজিওদের অর্থনৈতিক উৎসের ভিত্তি কি?

ঘ) কাজের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে এনজিও প্রতিষ্ঠান সমূহের কি ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান?সহযোগিতার নাকি বিরোধের?

ঙ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে এদের কোনো প্রকার সহযোগিতার জায়গা আছে কি?থাকলেও তার প্রকৃতি কিরূপ?

চ) সরকারী নীতির প্রতি এনজিও সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?

ছ) আর্থিক অনুদান লাভ শর্তাধীন নাকি শর্ত নিরপেক্ষ?

জ) সংশ্লিষ্ট এনজিও সংস্থা NGO Network এর আওতাধীন কিনা?

ঝ) সরকারী নীতিসমূহ এনজিও কার্যকলাপকে কি প্রভাবিত করছে ? যদি প্রভাব বিস্তার করে তা কতোটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক?

ঞ) এনজিও কার্যকলাপের মাধ্যমে উপভোক্তারা কতোটা উপকৃত হচ্ছেন?

ট) তারা এনজিওর প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন?

ঠ) এনজিও সংস্থার কাজের মূল্যায়ন কিভাবে সম্পাদিত হয়?

ড) মূল্যায়নের বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট এনজিও কিভাবে দেখছে? এই মূল্যায়নের বিষয়টি এদের কাজের ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলছে?